অক্টোবর ২০২২ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৯

# নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

## চিরকালের শিশু
## শেখ রাসেল

**মোছা. লামিয়া পারভীন**, ৪র্থ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

**হোমায়রা আলম**, ৮ম শ্রেণি, কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

# সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, ১৮ই অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে ছোট্ট সন্তান শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মবার্ষিকী। ১৯৬৪ সালের এই দিনে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে রাসেল। সেদিন ছিল খুশির জোয়ার আর আনন্দের ঝরনাধারা।

রাসেল কবুতর পছন্দ করত। বাড়ির পোষা কবুতরগুলোকে সে আদর করত, খাবার দিত। অন্যরা কবুতরের মাংস খেলেও রাসেল খেতো না। সে বলত কবুতর শান্তির প্রতীক। বন্ধুরা, তোমরা হয়ত জেনে থাকবে, ছোট্ট সেই রাসেলের গুণের কোনো অভাব ছিল না। সে পড়ত ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এদিন শেখ রাসেলও ঘাতকদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। শেখ রাসেলের জন্মদিনটি প্রতি বছর জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এবারের শেখ রাসেল দিবসের প্রতিপাদ্য– 'শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস'।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের হাত ধরেই এগিয়ে যাবে বিশ্ব। জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করে। তাই তো শিশুদের সম্মানে বিশ্বে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার পালন করা হয় 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ।' এবারের বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২২-এর প্রতিপাদ্য– 'গড়বে শিশু সোনার দেশ, ছড়িয়ে দিয়ে আলোর রেশ'।

এবারের নবারুণ আমরা সাজিয়েছি ছোটোদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে।

পড়ে জানিও কিন্তু, কেমন হলো এবারের সংখ্যাটি।

ভালো থেকো, নবারুণের সাথেই থেকো।

**প্রধান সম্পাদক**
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

**সিনিয়র সম্পাদক**
হাছিনা আক্তার

**সম্পাদক**
নুসরাত জাহান

**সিনিয়র সহ-সম্পাদক**
শাহানা আফরোজ

**সহ-সম্পাদক**
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

**সহযোগী শিল্পনির্দেশক**
সুবর্ণা শীল

**অলংকরণ**
নাহ্‌রীন সুলতানা

**সম্পাদকীয় সহযোগী**
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

**যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা**
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

**বিক্রয় ও বিতরণ**
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

**মূল্য : ২০.০০ টাকা**

**মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং**
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

# সূচিপত্র

## নিবন্ধ


চিরকালের শিশু শেখ রাসেল/আবুল হোসেন আজাদ ০৩
বিশ্ব শিশুর প্রতীক /ফরিদুর রেজা সাগর ১৩
আনন্দময় হোক শিশুদের শিক্ষা/মুহা. শিপলু জামান ১৫
শিশুর হাসিতে হাসবে বাংলাদেশ/ইসরাত জাহান ১৭
শিশুর জীবন হোক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময়/নুসরাত জাহান ২৩
বাবা হিমালয় মেয়ে পদ্মার রূপকথা/নাসরীন মুস্তাফা ২৫
হেমন্তের সোনালি প্রান্তর/এস আই সানী ৩০
গড়বে শিশু সোনার দেশ/মারজুক আবদুল্লাহ ৪০
বিদায় লিলিবেট/শাহানা আফরোজ ৫৪


## গল্প


রাসেল ও সাদা পালক/এমরান চৌধুরী ০৭
রাসেলের সাইকেল/কুমার প্রীতীশ বল ১৯
চাকতি/মনি হায়দার ৩৩
ছোটো থেকেই শিখতে হবে/রকিবুল ইসলাম ৪১
বন মোরগের লড়াই/ইউনুস আহমেদ ৫০


## সাফল্য প্রতিবেদন


রেকর্ড করা শিশুরা/শফিউল ইসলাম ৪৩
বাংলাদেশের রেকর্ডধারীরা/সানজিদ হোসেন শুভ ৪৫
অসাধারণ প্রতিভাধর শিশু/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ৪৬
শিশুদের অস্কার জিতল সিসিমপুর/রাশেদুল হক ৪৭
বাঘিনীদের জয়ের গল্প/মেজবাউল হক ৫৭
এশিয়ার সেরা বাংলাদেশের ফুচকা/জুনায়েদ কবির ৫৯
ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম সুমাইয়ারা/জান্নাতে রোজী ৬০
শিশুর মানসিক বিকাশে বই/মো. জামাল উদ্দিন ৬০
দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফফাত আঁখি ৬১


## কবিতা ও ছড়া


০৬ জুবাইর জসীম
১০ বেগম শামসুন নাহার/আসলাম সানি
১১ সুজন সাজু/নুরুল ইসলাম বাবুল
১২ বেণীমাধব সরকার/স্নিগ্ধা বাউল
১৮ সুষমা ফাল্গুনী
৩১ আলম শামস
৪৯ শহীদুল্লাহ শোভন
৫২ মোসা. মনিরা আহামেদ সিনথিয়া/কামাল হোসাইন


## ছোটোদের ছড়া/লেখা


৫৩ তৌফিক আলম/মালিয়া আলি জয়া
সাকুরা মেহজাবীন তনয়া/লামিয়া হোসেন
৫৬ শেহজাদী ফারহা অর্থি


## অ্যালবাম


৩৮ ছবিতে রাসেল


## ছোটোদের আঁকা


দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : মোছা. লামিয়া পারভীন
হোমায়রা আলম
৪৮ মুস্তানিবা মাবরুকা প্রতীতি/সায়মা আঞ্জুম বিভা
৫৬ রহমাতুল আলম
৬৩ মো. সাজ্জাদ হোসেন/মো. ইরফান হোসাইন
৬৪ ফাতেমা আক্তার ইচ্ছে/নীলাদ্রি শেখর সম্মদার



নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

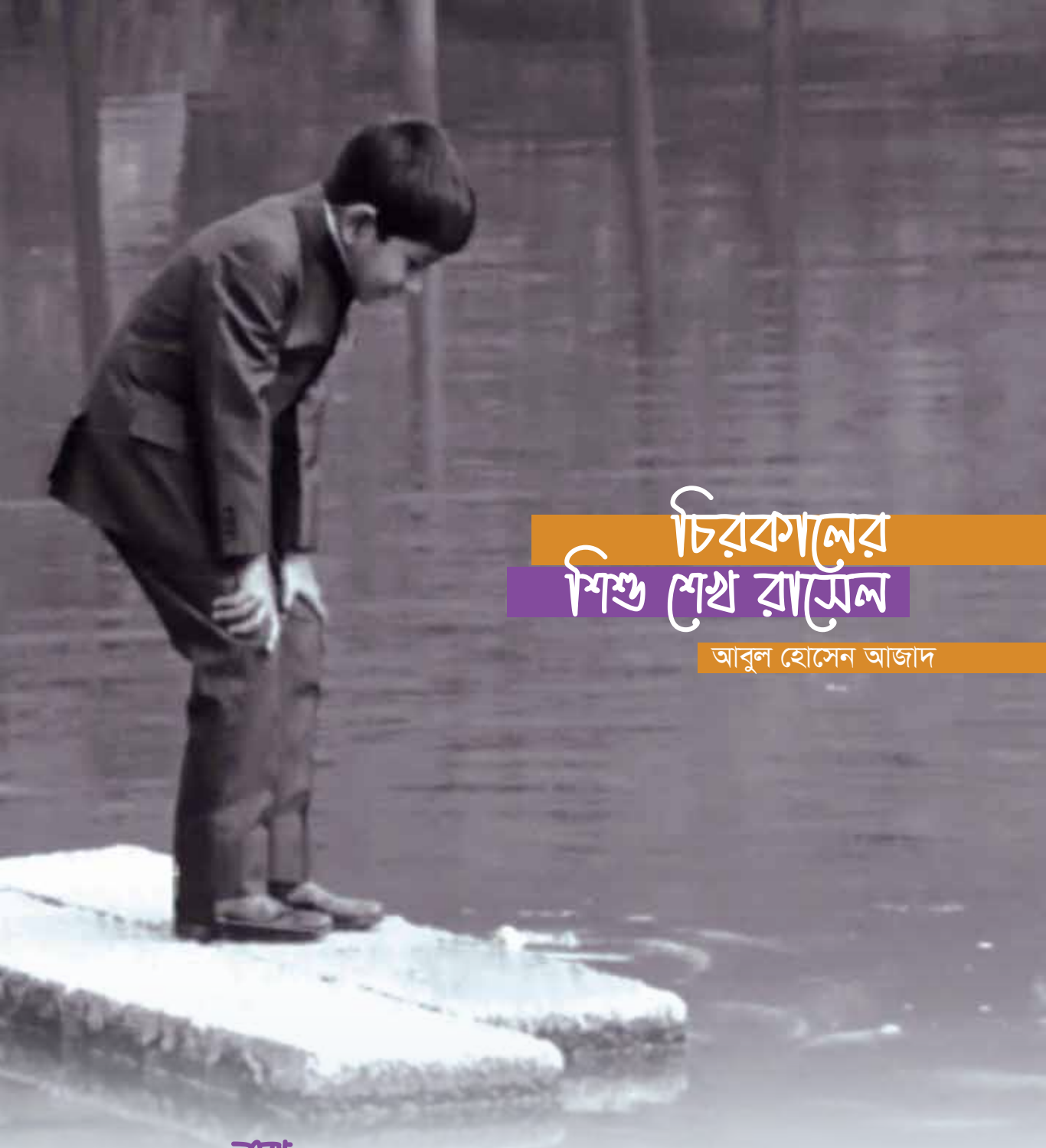

# চিরকালের শিশু শেখ রাসেল

আবুল হোসেন আজাদ

আমাদের পৃথিবী কত না সুন্দর। সুন্দর এই পৃথিবীতে রয়েছে চাঁদ, সূর্য, পাখি, গাছপালা, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, তারা ভরা আকাশ, ফুল, ঝরনা প্রভৃতি। মহান স্রষ্টার এসব অপূর্ব চির সুন্দর সৃষ্টি যেমন আমাদের উপকার করে, মুগ্ধ করে, তেমনই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রকৃতির এ রাজ্যে আমাদের শিশু মন যায় স্বপ্নের দেশে ডানা মেলে সাত

সমুদ্দুর তেপান্তরে হারিয়ে। বিচিত্র রং বাহারি পাপড়ি মেলে ফোটে ফুল। ফুল কে না ভালোবাসে। ফুলের মোহনীয় সৌন্দর্য-সৌরভে ছুটে আসে প্রজাপতি, মৌমাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ। ফুলের সৌন্দর্যে আমরাও মুগ্ধ হই। তাকে কাছে পেলে পরম যত্নে তুলে রাখি।

আমাদের শিশুরাও ঠিক ফুলের মতো। ওরা ফুলের মতো পবিত্র, নিষ্পাপ। শিশুরা আদরের ধন। ওরা আমাদের দেশের ভবিষ্যতের কাণ্ডারি। আমাদের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই শিশু যদি অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত, উপেক্ষিত কিংবা হত্যার শিকার হয় তাহলে? কালো মেঘের আড়ালে যদি পূর্ণিমার চাঁদ ঢাকা পড়ে তাহলে? তখন কি চাঁদ উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিতে পারে? না পারে না। পারে না সে পৃথিবীকে আলোকিত করে আঁধার তাড়াতে।

ফুলের মতো এমনই নিষ্পাপ সবার প্রিয় চিরচেনা বঙ্গবন্ধু তনয় ছিল শিশু শেখ রাসেল। সে ঝরে গেল ভোরের আলো আঁধারিতে। ঘাতকের বুলেট ছিনিয়ে নিল তার স্বপ্ন বোনা ছোট্ট কচি প্রাণ। সে বাঁচতে চেয়েছিল। চেয়েছিল তার প্রিয় মাতৃভূমির আলো হাওয়ায় বড়ো হতে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের ৬৭৭ নম্বরের বাড়িতে তাকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। হত্যা করে তার বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সবাইকে। শুধু প্রাণে রক্ষা পান বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থানের কারণে। এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞে সারা দেশের মানুষ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। সারা বিশ্ব অবাক হয়। এমন নিষ্ঠুর হঠকারী হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি।

পাষণ্ড কতিপয় বিপথগামী ঘাতক সৈন্যরা যখন হত্যার নেশায় মেতে ওঠে ঠিক তখনই দোতলা থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য রাসেল নিচে নেমে এসে কাজের ছেলে আব্দুর রহমানের কাছে আশ্রয় নেয়। তার পর পরই একজন ঘাতক সৈন্য এসে রাসেলকে ধরে ফেলে। তাকে আশ্বাস দেয় বাইরে পাঠিয়ে দেবে। শিশু রাসেল তখন কান্নাকাটি করতে থাকে। প্রাণ ভিক্ষা চায়। ঘাতকটির প্রাণে একটু দয়ার উদ্রেক হয়। তাই সে রাসেলকে লুকিয়ে রাখে বাড়ির গেটের সেন্ট্রিবক্সের ভিতর। তবু রাসেল বাঁচতে পারেনি। প্রায় আধাঘণ্টা পর এক মেজর রাসেলকে দেখে ফেলে। আর

রাসেলকে নিয়ে যায় দোতলায়। তারপর রাসেলের মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে। কী নিষ্ঠুরতা কী বিভৎসতা। রাসেলের দেহ নিথর নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে ভাবি সুলতানা কামালের লাশের পাশে লম্বা হয়ে।

শিশু রাসেলের সাথে ওরা আরো তিনজন শিশুকে হত্যা করেছিল। ওরা হলো– আরিফ, বেবী ও সুকান্ত বাবু। আরিফ ছিল আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের শিশু পুত্র এবং বেবী ছিল শিশু কন্যা। আর সুকান্তবাবু আবুল হাসনাত আবুদল্লাহর পুত্র। বেবীকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সকালে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো ডাক্তার তার চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসেনি। এক ফোঁটা ওষুধ কিংবা স্বাস্থ্যসেবা সে পায়নি। ঘাতকদের ভয়ে ডাক্তাররা এ কাজ করতে সেদিন বাধ্য হয়েছিল।

রাসেল আজ আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশের কোথাও নেই। নেই এই চিরসুন্দর পৃথিবীর কোথাও। সে চলে গেছে অচেনা বন্দরে। যেখান থেকে কেউ কোনোদিন আর ফিরে আসে না। কিন্তু সে আছে আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। হৃদয়ের আকাশে ভোরের শুকতারা হয়ে। তার ছোট্ট মুখের মিষ্টি হাসি আমরা কি ভুলতে পারি ? এই হাসি নিয়ে সে হয়ত একদিন বড়ো হয়ে জাতির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করত। গরিব-দুখির কষ্ট দূর করে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টায় ব্রতী হতো। হয়ত বড়ো হয়ে হতো বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার কিংবা বৈমানিক। কিন্তু সে আজ ধরা ছোঁয়ার বাইরে। শুধুই এখন স্মৃতি।

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ছিল শিশু রাসেলের নাড়ির টান। কারণ তার রক্তে প্রবাহিত ছিল জাতির পিতার রক্তধারা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সে প্রত্যক্ষ করেছিল ওই শিশু বয়সেই। তাই তো ঘাতকেরা ভয় পেয়েছিল কুড়ি থেকে পাঁপড়ি মেলে সদ্য ফোটা এই ফুলকে। হয়ত ভেবেছিল এই ফুলই একদিন কাঁটা হয়ে তাদের পায়ে, গায়ে বিঁধবে। তাই পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে একটুও ওদের হাত কাঁপেনি। একটুও ওদের হৃদয় টলেনি। একটুও ওদের চোখ ভিজে আসেনি।

শেখ রাসেলের জন্ম ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর। মাত্র এগারো বছর এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে সে বেঁচে ছিল। ঘাতকের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত না হলে

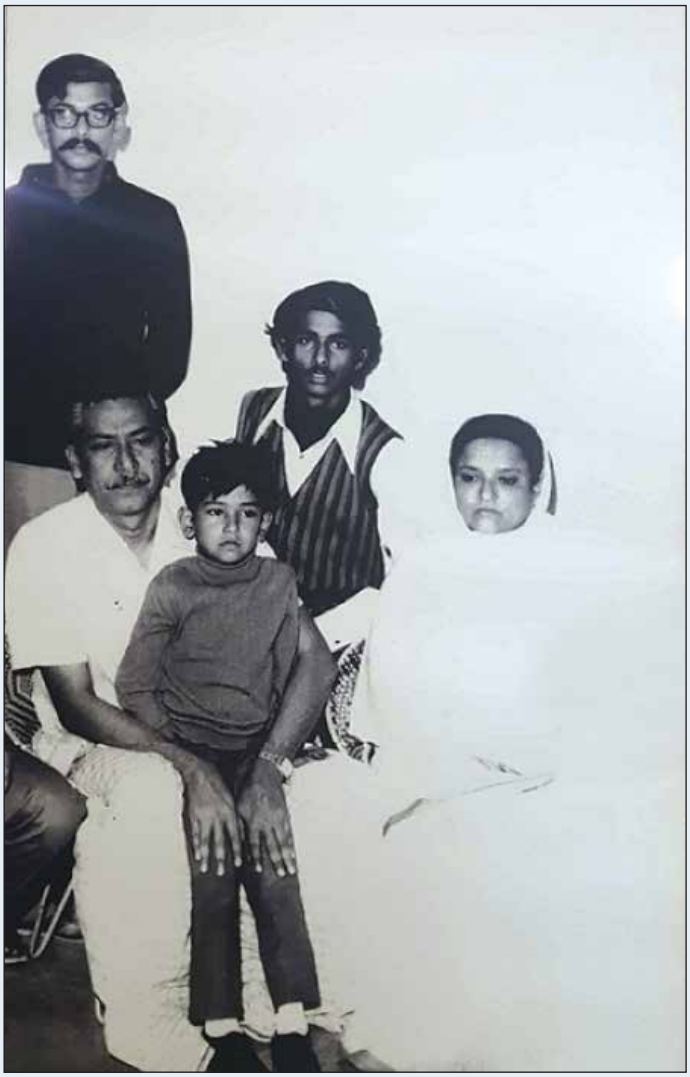

হয়ত এতদিন আমাদের মাঝে হাসি আনন্দে, সুখে-দুখে দিন কাটাত। আমাদের মাঝে থাকত তার বলিষ্ঠ পদচারণ। কিন্তু সে বাঁচতে পারেনি। বাঁচতে তাকে দেয়নি। তবু বাংলাদেশের পথে-ঘাটে-প্রান্তরে সবুজে-শ্যামলে, ধানের শীষে, দোয়েলের শীষে সে মিশে আছে। মিশে আছে রাতের আকাশে উজ্জ্বল ধ্রুবতারা হয়ে। মিশে আছে জেলের জালে, মাঝির পালে, কৃষকের হালে, বৃক্ষরাজির সবুজ পাতার পালে। আমরা যেমন ভুলতে পারিনি বঙ্গবন্ধুকে, তেমনি শিশু রাসেলকেও ভুলতে পারি না। ভোলা যায় না। হঠকারি অকৃতজ্ঞ বিপথগামী কতিপয় সৈনিকের মতো আমাদের হৃদয় পাষাণ হয়ে যায়নি। আমাদের চোখ তার স্মৃতিতে আজও সজল হয়ে ওঠে, ব্যথায় ব্যথায় ভরে যায়। মনের কথা অগোছালো হয়ে যায়। চোখের ও মনের পৃথিবীর রং বদলে যায়। শ্রাবণ মেঘের মতো ব্যথার ক্ষরণ যা কাউকে দেখানো যায় না। কাউকে বোঝানো যায় না। যা শুধু মনের গহীনে বাসা বেঁধে থাকে। সে বাসা দুরন্ত ঝড়ে ভেঙে পড়ে না, উড়ে যায় না।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনার পানি অনেক গড়িয়েছে। বদলেছে সময়। বদলেছে দিন। সময়ের বিচারে সেই সব ঘাতকদের বিচার হয়েছে। বিচারের রায়ে ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু এখনও কয়েকজন খুনি বিদেশে পালিয়ে আছে। জাতির দাবি তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে আদালতের রায় কার্যকর করা। যারা ফুলের মতো ফুটফুটে শিশু রাসেলকে হত্যা করেছে জাতিসহ বিশ্ববাসী দেখুক খুনির পরিণাম। রাসেল নেই। আছে শুধু স্মৃতি। সে স্মৃতি মেঘহীন অথৈ আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। এ স্মৃতি ভুলবার নয়। মুছবার নয়। যতদিন এই পৃথিবীর ফুল-পাখি-আলো-বাতাস থাকবে, থাকবে বাঙালি জাতি, ততদিন শিশু রাসেল আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে চিরকালের শিশু হয়ে। ■

*বীরমুক্তিযোদ্ধা ও শিশু সাহিত্যিক, সাবেক কর্মকর্তা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর*

# রাজকুমারের জন্মদিনে

জুবাইর জসীম

রাজকুমারের জন্মদিনে বাজল খুশির বীণ
চতুর্দিকে খুশির লহর তাকধিনা ধিন ধিন
পায়রা টিয়া ময়না পাখি
কিচিরমিচির ডাকিডাকি
বন্ধুরা তার আসলো সেজে খুশি সীমাহীন।
আকাশ সাজে রংধনুতে নীল চাঁদোয়া পরে
জোছনা মেখে পূর্ণিমা চাঁদ ঝিকিমিকি করে
চাঁদের বুড়ি সন্ধ্যা রাতে
তারাফুলে মালা গাঁথে
জন্মদিনে উইশ জানাতে আসলো হাওয়ায় চড়ে।
কিন্তু একি রাসেল কোথায়? রাসেল যে নেই বাড়ি
দেয়ালে তার ছবি দেখে মনটা সবার ভারী
পঁচাত্তরের আগস্ট মাসে
ওই বাড়িতে দৈত্য আসে
তখন থেকে রাসেল সোনা স্বর্গে দিলো পাড়ি।
জন্মদিনে রাসেল সোনা স্বর্গ থেকে নামে
বত্রিশ নম্বর বাসভবনে একটুখানি থামে
দেখতে থাকে ঘুরে ঘুরে
জন্মদিনের গানের সুরে
রাসেল সোনা শান্তি আনে লাল-সবুজের খামে।
হাসু আপু দেখে যদি আর দেবে না যেতে
স্বর্গপুরীর মজার খাবার আর পাবে না খেতে
তাই তো রাসেল পক্ষিরাজে
ছুটে চলে স্বর্গরাজে
সেখানে সে মহাসুখে থাকতে পারে মেতে।
রাসেল সোনার জন্মদিনে উঠল মেতে দেশ
চতুর্দিকে খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়ে বেশ
রাসেল আছে সবার মনে
জন্মদিনের আয়োজনে
থাকবে অমর জনম জনম, হবে না তার শেষ।

গল্প

# রাসেল ও সাদা পালক

এমরান চৌধুরী

বত্রিশ নম্বর বাড়িটিতে আজ অপার আনন্দ। সেই আনন্দ থোকায় থোকায় জোনাকের মতো জ্বলে উঠছে রানু আপুর চোখে-মুখে। ঘুম থেকে জেগে উঠতেই খবরটা কানে আসে রানু আপুর। এমন একটা খবর শুনে কার না নাচতে ইচ্ছে করে।

ফুফি বললেন, 'তোর ভাই হয়েছে রে রানু! কথাটা শোনামাত্র ওর বুকটা পলকে এক বিঘত লম্বা হয়ে যায়।

এতদিন শুধু হাসু আপু গর্ব করত। ওর ভাই কামাল, ওর ভাই জামাল বলে। হাসু আপুর মুখে ভাই ভাই কথা শুনে রানু আপুর বুকের ভেতরের কলজেটা বেশ বেজার হতো। মাঝেমধ্যে কলজেটা নেই নেই মনে হতো। মনের মধ্যে একটা জেদ জাগত ওর যদি একটা ভাই হয় তবে এক হাত দেখিয়ে ছাড়বে হাসু আপুকে। একদম কোলে নিতে দেবে না। ও একাই সারাদিন কোলে নিয়ে বসে থাকবে।

ভাবতে গিয়ে রানু আপুর মন প্রজাপতি হয়ে যায়। ওর উড়তে ইচ্ছে করে। এক লাফে পেরিয়ে যায় বত্রিশ নম্বরের লম্বা আঙিনা। ঢুকে যায় এক বাড়িতে।

পাশাপাশি দুটো বাড়ি। চারিদিকে সীমানা প্রাচীর। একদিকে ছোটো একখানা ফটক আছে। ওই ফটক দিয়ে দুই বাড়ির সদস্যরা যখন খুশি যাতায়াত করে। পরস্পরের সুখের খবর, দুঃখের খবর ভাগাভাগি করে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সবাই মানে হাসু আপু, কামাল ভাই, জামাল ভাই এবং রানু আপুরা ছুটে যান ওই বাড়িতে।

ওই বাড়ির গৃহকর্ত্রী একজন বড়ো মাপের শিক্ষক। দেশের সবচেয়ে বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। রানু আপু সেই বাড়িতে

ঢুকেই বড়ো বড়ো শ্বাস নিতে নিতে বললেন, 'খালাম্মা! আমাদের ভাই হয়েছে।' খালাম্মা দেখতে পেলেন ওর চোখ দুটো টর্চলাইটের মতো জ্বলছে। তাতে ঝিলিক দিচ্ছে খুশি আর খুশি।

খবরটা দিয়েই ফের এক দৌড়ে পৌঁছে গেলেন নিজেদের বাড়িতে।

নবজাতককে দেখতে যেতে একটুও দেরি করলেন না খালাম্মা। দেখতে গিয়ে চোখ দুটো জুড়ে গেল, মন ফুরফুরে হলো। 'রানুদের ভাইটি খুব সুন্দর হয়েছে যেন রাজপুত্তুর। মাথা ভরা কালো চুল আর ফুলোফুলো দুটি গাল। দেখেই গাল টিপতে ইচ্ছে করে।'

রানু আপু সারাদিন ভাইয়ের চারপাশ ঘিরে ঘুর ঘুর করেন। চোখ খুললেই এটা ওটা বলে ওর দিকে দৃষ্টি আনার চেষ্টা করেন। এতটুকুন ছেলে কারও দিকে চোখ রাখার কথা নয় কিন্তু রানু আপা তা বুঝতে চান না। ওর ধারণা ওর ভাই ওর দিকে তাকাবেই।

খানিক পর পর কোলে নিতে চান রানু আপু। কিন্তু বাধ সাধেন হাসু আপু। বলেন, 'ওকে যখন তখন কোলে নেবে না। যখন নেবে সাবধানে নেবে'। মা দু'বোনের মিষ্টি বখরা খুব উপভোগ করেন। রানু আপুকে শান্ত করতে মা বলেন, 'হাসু, ঠিকই বলেছে! ছোটো শিশুকে কোলে নিতে গিয়ে অনেক সময় গিরা নড়ে যায়।'

মায়ের কথা রানু আপুর মনে ধরল না। মুখটা ডাবলু করে খাটের এক পাশে বসে থাকলেন। মা রানু আপুর অভিমান বুঝতে পেরে কাছে ডাকলেন। পা দুটো গুটিয়ে সাহেবি বসার ভঙ্গিতে বসতে বললেন। তারপর নকশিকাঁথায় জড়ানো শিশুটিকে তার কোলে আলতো করে তুলে দিলেন। অমনি পিক করে হাসি ফুটে উঠল রানু আপুর মুখে।

একদিন শুভক্ষণ দেখে ভাইটির নাম রাখা হলো রাসেল। নামটি ছিল রানু আপুর মা ও বাবার খুব পছন্দের। বার্ট্রান্ড রাসেল নামে একজন বড়ো মাপের লেখক ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁরই নামে নাম রাখা হয় রাসেলের। বাবা-মায়ের স্বপ্ন ছিল তাঁদের রাসেলও অনেক বড়ো মানুষ হবে।

এ কোল ও কোল করে বড়ো হতে থাকে রাসেল।

সবার ছোটো বলে তার আদরের কোলও ছিল অনেক। তাকে কোলে নেওয়া নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি চলত। হাসু আপু,রানু আপু এই দুই আপু কে কার আগে কোলে নেবে তাই নিয়ে চলত হরদম প্রতিযোগিতা। হাসু আপু নিলে রানু আপু গাল ফুলিয়ে ঢোল করত। এই নিয়ে অভিমানও চলত সমান্তরাল। সেই সাথে মায়ের কোল, ফুফির কোল তো ছিলই।

তবে বাবার কোল রাসেল খুব একটা পেত না। কারণ বাবা রাজনীতি করতেন। রাসেল যেদিন জন্ম নেয় সেদিন তার বাবা বাড়িতে ছিলেন না।

আবার যখন একটু একটু করে বড়ো হতে থাকে তখনও বাবাকে পেত খুব কমই। বাড়িতে এই আছেন আবার এই নেই হয়ে যেতেন তিনি। তাই মা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবই ছিলেন রাসেলের মা ও বাবা।

রাজনৈতিক কারণে বঙ্গবন্ধুকে যখন তখন গ্রেফতার করা হতো। বছরের নয় মাসই তাঁকে কাটাতে হতো কারাগারে, নইলে ঢাকার বাইরে। এখনকার বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া এমন কোনো জায়গা নেই যেখানটায় তিনি যাননি, জনসমাবেশে বক্তৃতা করেননি। তাই বাবাকে যখন কাছে পেতো রাসেল তখন কোল থেকে নামতেই চাইত না, আর বুদ্ধি হওয়ার পর বাবা বাসায় থাকলে তাঁর গা ঘেঁষেই থাকত সব সময়।

রানু আপু ও হাসু আপুর আদরের ভাইটির প্রিয় ছিল কবুতর। তাই বত্রিশ নম্বর বাড়িতে অনেক কবুতর পোষা হতো। কবুতর নিয়ে সে খুব মজা করত। কবুতরকে সে নিজের হাতে খাবার দিত। ওরা যখন ঝুঁটি নাচিয়ে খুঁটে খুঁটে খাবার খেতো আর বাকুম বাকুম করে ডাকত তখন রাসেল খুশিতে হাততালি দিত। কবুতরকে রাসেল এতই ভালোবাসত যে তাদের বাড়িতে কবুতর জবাই করা হতো না। কখনো জবাই হলে সে কবুতরের মাংস খেতো না।

সেদিন সন্ধ্যার পর কবুতরগুলো জোড়ায় জোড়ায় বাসাতে ঢুকে পড়ে। কবুতরগুলোর জন্য ছিল সুন্দর করে বানানো বাসা। খাসা বাসা। নিয়মমাফিক বাড়ির কাজের লোক লাগিয়ে দেয় বাসার ঝাপ। শেষ রাতে

হঠাৎ মুহুর্মুহু গুলির শব্দে এদের কচি বুক ধড়ফড় করে ওঠে। অসময়ে ভেঙে যায় ঘুম । এর আগে কখনো এরা গুলির শব্দ শুনেনি। শুনেছে মানুষের উচ্ছ্বাস ধ্বনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে দলে দলে লোক আসত আর যেত। কখনো মিছিল আসত জোয়ারের মতো। মিছিলে স্লোগান হতো, তালি হতো। এতটুকুর সাথে কবুতরগুলো সয়ে গিয়েছিল। আজকের অবস্থা এদের কেমন যেন অন্যরকম মনে হলো। এদের কানে ভেসে আসে রাসেলের আকুতি, 'আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না।' রাসেলের গলা শোনামাত্রই বাসার ভেতর থেকে বেরোতে এরা বার বার ডানা ঝাপটাতে শুরু করে। এদের ডানা ঝাপটানি শুনে কেঁপে ওঠে এক দানবের বুক। সে এলোপাথাড়ি গুলি করা শুরু করে। এই গুলিতে কবুতরের সবকটি বাসা ছিটকে পড়ে দূরে। অনেক দূরে। এর মধ্যে এক জোড়া কবুতর প্রাণপণে উড়ে যায় রাসেলের শোবার ঘরের কাছাকাছি।

এরা গলা তুলে রাসেলকে খুঁজতে থাকে। ইতিউতি তাকাতেই দেখতে পেল ভয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকা রাসেলকে। কাঁপতে কাঁপতে সে আকুতি করে বলছিল, 'আমাকে মেরো না। আমাকে মেরো না। আমাকে হাসু আপুর কাছে যেতে দাও।'

রাসেলের এ আকুতি শুনে কবুতর দুটো আর থির থাকতে পারল না। এরা এক উড়ালে রাসেলের সামনে এসে পড়ল। ঠিক তখনই গর্জে ওঠে তার বুক বরাবর তাক করা রাইফেলটি।

একটা নয়, দুটো নয় অনেকগুলো গুলি এসে রাসেলের বুকে। সে ঢলে পড়ল মেঝেতে। ধবধবে সাদা কবুতর দুটোরও ছিন্নভিন্ন পালকগুলো রাসেলের নিথর দেহের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। মনে হলো পালকগুলো রাসেলকে পরম মমতায় আগলে রেখেছে। ■

*শিশু সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক, সাবেক স্বাস্থ্য পরিদর্শক*

# কবিতায় শেখ রাসেল

## আমি কালের স্বাক্ষী

বেগম শামসুন নাহার

আমায় তুমি চিনেছ কবি
সেদিন তখনও বাংলার আকাশে উদিত
হয়নিকো রবি,
হয়নিকো পিতার কোলে বসে
আহার গ্রহণ-
মাতার বকুনি খাওয়া
হয়নিকো পরশ নেওয়া
পরম স্নেহের...
আমার হাসু আপুর।
হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো,
রক্তের হলি খেলায় মেতেছিল দুর্বৃত্তরা
বুলেটের আঘাতে আঘাতে শহিদ হলেন-
পিতা-জননি-ভ্রাতা-ভগিনিরা
নিথর পড়ে রইলেন তারা
বুলেটের আঘাতে বুকের রক্ত
ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল সব
রঞ্জিত হলাম আমিও-
ভিজে গেল ইতিহাসের পাতা।
সেই থেকে বাংলার এক কালো অধ্যায়ের
গর্বিত শহিদ আমি;
আমি কালের স্বাক্ষী
সেই শিশুটি শহিদ শেখ রাসেল।
আর একবার ইতিহাসের পাতায়-
লিখে দিও তুমি...
লিখে দিও আমার নাম।

## ছোট্ট সোনা শিশু রাসেল

আসলাম সানি

তারই মুখের ছবি হাসে
সন্ধ্যাকাশের  তারায় তারায়
মেঘ তাড়িয়ে তারই পাশে
চন্দ্র এসে থমকে দাঁড়ায়
ছোট্ট সোনা শিশু রাসেল
এই অবেলায় কোথা হারায়?

গাছে গাছে-ফুলে ফুলে
মৃদু হাওয়ায় দুলে দুলে
প্রজাপতি ভাসে
তখন দেখি রোদের খেলা
উদার নীলাকাশে
সেখানেও রাসেলমণি
ফিরে ফিরে আসে
প্রাণ খুলে ফের হাসে

সকাল সাঁঝে সকল কাজে
তারই কথা ভাবি
বাংলাদেশের হৃদয়পুরে
দেখতে তাকে যাবি?
সব শিশুরই সুখে-দুঃখে
তারই দেখা পাবি।

# রাসেল স্মৃতি

সুজন সাজু

রাসেল,
একটি অবোধ শিশু ছিল
ভালোবাসার যিশু ছিল
আদর মাখা মুখটি ছিল সোহাগ ভরা ঠোঁটে,
হাসলে রাসেল লাগত যেন গোলাপ জবা ফোটে।

রাসেল,
চাঁদের আলো জোছনা মাখা
নিষ্পাপ শিশু দোষ না থাকা
বুকের মানিক মায়ের কোলে দোলনা দোলে দুলত,
আলতো পায়ে ছুটলে রাসেল খুশির বয়াম খুলত।

রাসেল,
আপুর কাছে পুতুল সোনা
ভাইয়ের আদর তুতুল সোনা
বাবার খুশি রাগের ঔষধ জড়িয়ে ধরা গলা,
কেউ কখনো দেয়নি তারে একটুও কানমলা।

রাসেল,
থাকলে হতো বাবার মতো
একটি পরম পাবার মতো
হয়ত দেশের হাল ধরিত স্বপ্ন রঙিন আশায়,
উঠলে মনে রাসেল স্মৃতি চোখের জলে ভাসায়।

# মুজিব-রাসেল

নুরুল ইসলাম বাবুল

শেখ মুজিবুর জাতির পিতা
রাসেল আমার ভাই
বাংলাদেশের সবুজ মাঠে
তাঁদের খুঁজে পাই।

পাখির গানে নদীর তানে
সবখানেতেই দেখি
মিলেমিশে রয়ে গেছেন
রাসেল-মুজিব এ কি!

নিশীথ রাতে থামে যখন
সকল কলরব
বুকের ভেতর টের পেয়ে যাই
ভিন্ন অনুভব।

কে বলছে মুজিব-রাসেল নাই
তাদের আমি সবখানেতে পাই।

# ছোট্ট খোকন রাসেল

বেণীমাধব সরকার

ছোট্ট খোকন রাসেল সোনার
দোষ কী ছিল বলো ?
মনের মাঝে ছিল না তার
সামান্যতম ছলও।
পাখির সাথে খেলত রাসেল
বলত কথা ধীরে
প্রজাপতির সঙ্গে বুঝি
নাচত ঘুরে ফিরে।

ফুল বিলাসী মন ছিল তার
ফুলের মতোই প্রায়
বাকবাক্কুম পায়রাগুলো
বাসত ভালো তায়।
পাড়ার যত খোকাখুকু
বন্ধু ছিল তার
সবার সাথে মিল ছিল তার
বড়োই চমৎকার!

প্রশ্ন এসে ভিড় করে আজ
সব শিশুদের মনে
ফুলের মতো বন্ধু তাদের
হারালো কোন বনে ?
খেলার সাথি দিবস রাতি
'রাসেল' বলে বলে
দুঃখ শোকের গহীন ব্যথায়
ভাসে চোখের জলে।

# রাসেল সোনা

স্নিগ্ধা বাউল

রাসেল আছে শাপলা ফুলে
বিলের জলে হাসি মুখে,
দোয়েল পাখি লেজ নাচিয়ে
রাসেল নামে ডাকে সুখে।

ইলিশ মাছের রূপোর ছবি
পদ্মা নদীর জলে,
কাঠবিড়ালি পেয়ারা ডালে
ফুরুৎ করে চলে।
সবুজ টিয়ার লালচে ঠোঁটে
বাংলাদেশের ছবি,
এমন দেশের শিশু রাসেল
ভালোবাসার কবি।

কেমন করে সব হারালো
শোকের আগস্ট মাসে
ছোট্ট শিশু রাসেল সোনা
সবাই ভালোবাসে।

অন্ধকারের পুব আকাশে
ধ্রুবতারা জ্বলে
সোনার ছেলে রাসেল সোনা
মায়েরা সব বলে।

# বিশ্ব শিশুর প্রতীক

ফরিদুর রেজা সাগর

*রাসেল আমার ভাই।*
*রাসেল আমার স্বজন।*
*রাসেল স্বপ্নমাখা এক শিশু।*
*রাসেল বাংলাদেশের শিশুদের প্রতীক।*
*বিশ্ব শিশুদের প্রতীক।*

রাসেল বঙ্গবন্ধুর পুত্র। রাসেল বড়ো বোনদের ভালোবাসা। বড়ো ভাইদের চোখের মণি।
রাসেল একজন স্বপ্নডানার পাখি। রাসেল মানে কাঠের বন্দুক। বত্রিশ নম্বর বাড়ির উঠোনে খেলাধুলা। ছাদে উঠে আকাশ দেখা। এক চিলতে করিডোরে দারোয়ান চাচার সঙ্গে গল্প করা। মায়ের হাতে খাবার খাওয়া। বাবার সাথে খাবার টেবিলে খেতে বসা।
স্কুলব্যাগ কাঁধে স্কুলে যাওয়া। রাসেল একজন শিশু। তার চারপাশে স্বপ্নের হাতছানি। রাসেল তার বড়ো দুই বোনের ভালোবাসায় সিক্ত এক ছোটো ভাই। আদর স্নেহ আর ভালোবাসার প্রতীক।
সেই রাসেলকেও জীবন দিতে হয় ঘাতকের নির্মম বুলেটে। এরকম নিষ্ঠুর ঘটনা ইতিহাসে খুব বেশি নেই। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ঘাতকের কাছে কাতর আর্তনাদ করে শিশুপুত্র। আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো। আমি মায়ের কাছে যাব।
কোনো এক নরপশু তখন বলে ওঠে, হ্যাঁ তোকে

মায়ের কাছে চিরদিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। তারপরই বিদীর্ণ করে শিশু রাসেলের বক্ষপিঞ্জর।

এই ঘটনা লিখতে গেলে স্তব্ধ হয়ে যায় কলম।

হৃদয় ভারি হয়ে আসে। চোখের জলে ভাসে বুক। এমন নির্মম এমন পৈশাচিক ঘটনা। এমন নিষ্ঠুর ব্যাপার যেন কারবালার শোকাবহ ঘটনাকেও হার মানায়। এত বড়ো বেদনার ঘটনাকে নিয়ে কিছু লেখা যায় না।

রাসেল এখন শিশুদের প্রতীক। অনন্তকাল এই শোক আমাদের বহন করতে হবে।

শোক যেন শক্তি সাহস ও কর্ম উদ্দীপনায় পরিণত হয়। রাসেলের মৃত্যু যেন আমাদের প্রেরণার উৎস।

আর কোনো শিশুকে যেন কখনো এমনভাবে জীবন দিতে না হয়। সেই লক্ষ্যেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। কোনো শিশুকে যেন রাসেলের পরিণতি বহন করতে না হয়। সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ।

প্রিয় রাসেল, তোমাকে আমরা স্মরণ করব সবসময়। শিশু অধিকার বাস্তবায়ন হবে তোমার স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে। বাংলাদেশের শিশুদের সকল অধিকার নিশ্চিত হবে। সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমাদের প্রিয় নেত্রী। শিশুদের খাদ্য যেন নিশ্চিত হয়। রাসেলের জন্মদিনে এটাই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। রাসেলকে আমরা স্মরণ করব আর দৃঢ়ভাবে শপথ নেব, বাংলাদেশের প্রতিটা শিশু যেন সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দের মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে।

## দুই

রাসেল জীবন পেয়েছিল মাত্র দশ বছরের। অতি সংক্ষিপ্ত শিশুজীবন। শিশুদের কি হত্যা করা যায়? কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল রাসেলকে? সে ব্যাপারে বিশদ কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না।

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। কিন্তু বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী দেশি-বিদেশি শত্রুদের অপতৎপরতায় ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের মহান স্থপতি বাঙালির মুক্তিদাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয় সপরিবারে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কেবল নিছক হত্যাকাণ্ডই ছিল না- এর মধ্য দিয়ে তারা ধ্বংস করতে চেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে। নির্বাসন হয়েছিল গণতন্ত্র। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ও নীতিকে।

শোকাবহ পনেরো আগস্ট ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত হয়েছে– ছড়া, কবিতা, গান, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ। দেশ-বিদেশে অজস্র রচনা। সম্ভবত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক লেখা রচিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলকে নিয়েও লেখকেরা করুণ ও আবেগঘন অনেক রচনা লিখেছেন। মানবিকতার লাঞ্ছনা ও অবিচার কবি হৃদয়কে ক্ষুব্ধ করেছে বার বার। আমাদের লেখকেরা রাসেলকে নিয়ে অসাধারণ সব রচনাসমূহ সমৃদ্ধ করেছে আমাদের সাহিত্যকে। কবি মহাদেব সাহা লিখেছেন:

*এক যে ছিল সোনার ছেলে রাসেল তার নাম*
*তার জন্য ভোরের আকাশ কাঁদছে অবিরাম,*
*কাঁদছে নদী, কাঁদছে সাগর, কাঁদছে মেঘদল*
*কোথায় গেল রাসেল সোনা, সবার চোখে জল;*
*রাসেল আছে বাংলাদেশের হৃদয়খানি জুড়ে*
*রাসেল আছে বুকের মাঝে যায়নি মোটেও দূরে।*

কিংবা বেবী মওদুদ লিখেছেন:

*রাসেল রাসেল কোথায় রাসেল*
*মায়ের কাছে আয়*
*রক্তে ভেজা রক্তগোলাপ*
*মায়ের আঁচলছায়।*
*রাসেল রাসেল কোথায় রাসেল*
*বাবার কাছে আয়*
*রক্তে ভেজা শরীর দেখে*
*রাসেল কাঁদে হায়।*

*রাসেল রাসেল কোথায় রাসেল*
*কামাল জামাল ডাকে*
*ভাবিরা সব ঘুমিয়ে কেন*
*অবাক চেয়ে থাকে।*

এইসব লেখার মধ্যে রাসেল সোনা বেঁচে থাকবে চিরদিন। ■

---

*শিশু সাহিত্যিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক*
*চ্যানেল আই টেলিভিশন*

# আনন্দময় হোক শিশুদের শিক্ষা

মুহা. শিপলু জামান

জীবনের প্রথম স্কুল সব শিশুদের জন্য আবেগ, উচ্ছ্বাস বা আনন্দের হলেও অনেক সময় বাচ্চাদের মধ্যে তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অথচ স্কুল শুরুর প্রথম দিনটি সবার জন্য হয় জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ও আকর্ষণীয় দিন। কিন্তু কিছু বাচ্চারা স্কুলে যায় মনমরা হয়ে। সেখানে কেমন যেন চুপচাপ থাকে, স্কুলে যাওয়ার সময় মন খারাপ করে, সকালের নাশতা খেতে চায় না। বিষয়টি সকল বাবা-মার খেয়াল করা প্রয়োজন, এতে উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত না হয়ে সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করে, অনুধাবন করা ও সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা উচিত।

এই সমস্যার নানাবিধ কারণ থাকতে পারে, প্রথমত বাচ্চারা হয়ত স্কুলকে আনন্দের সাথে উপভোগ করতে পারেনি। স্কুল শুরুর আগে শিশুরা স্বাধীন জীবনযাপন করে, কিন্তু স্কুল শুরু হলে তার দৈনন্দিন জীবন একটা নিয়মের মধ্যে চলে আসে। পাশাপাশি নতুন পরিবেশে বড়ো হওয়া শিক্ষক ও শিশুদের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। ছোটো বয়সে আসলেই তা কষ্টকর। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে বিদ্যালয়কে বাচ্চাদের কাছে আনন্দময় করতে প্রতিদিন স্কুল শুরুর সময় শিক্ষকগণ স্কুলের প্রধান ফটকে দাঁড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানায়, অনেক সময় মজার মজার গেম খেলে তাদের স্কুলে প্রবেশ করায়। ফলে ছোটো ছোটো সহজ বিষয়গুলো কোমলমতি স্কুল শিক্ষার্থীদের কাছে পাহাড়সম বিশাল ও কঠিন মনে হয় না।

পরের বিষয়টা প্রথম সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। বর্তমান শিশুরা জন্মের কিছুদিন পর থেকেই তাদের খাওয়া, খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য মোবাইল, ল্যাপটপ বা ট্যাবের স্ক্রিনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরে। বাচ্চারা মোবাইলে ভিডিও, কার্টুন দেখতে দেখতে খুব সহজেই খাবার খাচ্ছে, এতে মা ও খুব

খুশি। কিন্তু বাচ্চারা বুঝতে পারে না তারা কী খাচ্ছে, কতটুকু খাচ্ছে। খাবারটার স্বাদ কেমন। কারণ তাদের পুরো মনোযোগ থাকে মোবাইলের স্ক্রিনে। একইভাবে অতিমাত্রায় মোবাইল নির্ভরতা বাচ্চাদের সুকুমার বৃত্তি ও মানবীয় গুণাবলি বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। পরিবেশ, প্রকৃতি ও বাহ্যিক জ্ঞান সবদিক থেকেই তারা পিছিয়ে পরছে। তারা এখন পাখি বা গাছ দেখলে আলাদা করে নাম বলতে পারে না, জাতীয় দিবসগুলো জানে না, বাংলা মাসের নাম বলতে পারে না। অথচ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রত্যেক অপশনগুলো তাদের নখদর্পণে। পড়তে বসলে মন পরে থাকে মোবাইলের গেমে কিংবা কার্টুনে। এছাড়া অতিরিক্ত মোবাইল বা কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকায় শিশুদের চলাফেরা, খেলাধুলা কম হচ্ছে। ফলে তারা স্থূলাকার শরীর ধারণ করছে এবং তাদের চোখের বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আর সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে– শিশুরা অন্য শিশু বা মানুষের সাথে সহজে মিশছে না, একা একা থাকার অভ্যাস গড়ে উঠছে।

তৃতীয় সমস্যাটা মা-বাবা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য তৈরি হয়। শিশুরা যেমন অতিমাত্রায় মোবাইল ব্যবহার করছে, তেমনি বড়োরাও অত্যধিক পরিমাণে প্রযুক্তি আসক্ত হয়ে পড়ছেন। ফলে দেখা যায়, একই ঘরে মা, বাবা ও শিশুরা আলাদা আলাদা স্থানে অবস্থান করে। ফলে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়তা হারাচ্ছে। প্রেক্ষিতে শিশুরা পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, একাকী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং স্বাভাবিক সুস্থ জীবন থেকে ধীরে ধীরে বিষণ্নতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এমতাবস্থায় শিশুদের বাবা-মা, শিক্ষক পরিজনসহ সকলের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম কাজ হচ্ছে মা-বাবাসহ পরিবারের সকলকে শিশুদের জন্য সময় দিতে হবে। শিশুদের নিয়ে প্রকৃতির কাছে যেতে হবে। প্রাণিকূল ও বৃক্ষরাজির সাথে শিশুদের পরিচয় করে দিতে হবে। দেশ ও বিদেশের নানান রকম গুরুত্বপূর্ণ ও মজাদার তথ্য শিশুদের জানাতে হবে। দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে নিতে হবে এবং আশপাশের রাস্তাঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা চেনাতে হবে। এছাড়া মজার মজার গল্প বলে স্কুল সম্পর্কে শিশুদের মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে হবে। শিক্ষা ও স্কুল নিয়ে তাদের স্বপ্ন দেখাতে হবে এবং বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে। তবেই শিশুদের মন থেকে স্কুল ও লেখাপড়া নিয়ে অযাচিত ভয় দূর হবে। শিক্ষাকে শিশুদের কাছে আনন্দময় করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে আনন্দহীন পাঠদান সম্পূর্ণ বৃথা। আনন্দ নিয়ে পড়লে অনেক কঠিন বিষয়ও সহজ হয়ে যায়।

শিশুদের সাথে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে তাদের সাথে শিশুর মতো মিশতে হবে ও ব্যবহার করতে হবে। মোবাইল কম্পিউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রের উপর শিশুদের সময় ব্যয় ও অভ্যস্ততা কমানোর জন্য শিশুদের বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কাজে জড়িত করতে হবে। তাছাড়া বাসায় পোষা প্রাণী যেমন কুকুর, বিড়াল, মুরগি, খরগোশ কিংবা কবুতর পালন করা যায় অথবা বাগান করা যায় যেখানে শিশুরা সময় অতিবাহিত করবে। বর্তমান প্রজন্মের শিশুরা বইপড়া বিমুখ, তাই তাদেরকে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশে ক্রিকেট, ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলার চর্চা হয়, আমাদের শিশুদের বহিরাঙ্গন খেলাধুলায় জড়িত করতে হবে, তাতে করে তাদের দেহ ও মন সুস্থ থাকবে। শিশুর বাবা-মা ও পরিজনদেরও মোবাইল আসক্তি কমাতে হবে- এটা নিজের ও শিশুর জন্য জরুরি। তা না হলে শিশুর সাথে বাবা-মা'র দূরত্ব বেড়ে যাবে, শিশু বিষণ্নতায় ভুগবে।

তাই আমাদের সকলের উচিত শিশুকে সময় দেওয়া, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, ভালো কথা বলা। শিশুদের ভালো ভালো কাজ যেমন-গরিবকে দান করা, মানুষের উপকার করা, পশুপাখির প্রতি যত্নবান হওয়া ইত্যাদি শিখাতে হবে। যাতে তারা বড়ো হয়ে ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। আসুন সবাই আমরা নিজ নিজ শিশুকে সঠিক শিক্ষা প্রদান করি এবং ভবিষ্যৎ দেশ গঠনে নেতৃত্ব গড়ে তুলি। ■

পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

# শিশুর হাসিতে হাসবে বাংলাদেশ

ইসরাত জাহান

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুরা যেন নিজেদের ভাষা শিখতে পারে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে স্পষ্টভাবে তা বলা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করার কথা বলা আছে। সরকার বাংলাদেশের বসবাসকারী ৫০টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তালিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০টি ভাষার প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সকল শিশুর মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী শিশুদের পড়ালেখার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০১২ সালে। প্রথমে পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এবং সমতলের সাদরি ও গারো এই পাঁচটি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। দ্বিতীয় ভাগে ম্রো, মনিপুরি, খাসি এবং বমসহ ছয়টি ভাষায় এবং তৃতীয় ভাগে কোচ, ওঁরাও, হাজং, রাখাইন, খুমি ও খ্যাং ভাষায় এবং পরবর্তীতে অন্য ভাষাতেও প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ার কথা রয়েছে।

২০১৭ সালে ৫টি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিকের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের হাতে তাদের নিজ ভাষায় বই তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তাদেরকে পড়ানো বা শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব। সেসব নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের নিজ ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যাঘাত ঘটে।

ভাষা কেবল আমাদের জন্যই নয় পৃথিবীর একটা বড়ো সম্পদ। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। নিজস্ব বা আলাদা আলাদা ভাষা থাকা সত্ত্বেও বাংলা

ভাষায় পড়লে তাদের ভাষা সমৃদ্ধির বিষয়টি অবহেলিত থাকে। এভাবে ভাষা হারিয়ে যেতে সময় লাগবে না। এটা হবে দুঃখজনক। এই ভাষাগুলোকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। পৃথিবীতে ভাষার ব্যবহার কমে যাওয়া ভাষার জন্য একটি হুমকি।

বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর সংরক্ষণ করার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আইন-২০১০ প্রণয়ন করে বর্তমান সরকার। দেশে কয়টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জাতি আছে, তাদের কয়টি ভাষা আছে, এসব ভাষার অবস্থা কেমন তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই সেভাবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে বলা যাক। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুরা অনেক সময় অন্যান্য শিশুদের সাথে নিজ ভাষার কথা বলতে সংকোচ বোধ করে। এটা প্রধান একটি চিত্র। বিড়ম্বনা এড়াতে তারা নিজ ভাষা ছেড়ে বাংলার আশ্রয় নেয়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভাষা ইনস্টিটিউটে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে কোনো বিভাগ না থাকলেও অনেক ভাষার কোর্সই আছে সেখানে। এদের ভাষার বিষয়টি এতে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মানুষকে তার ভাষার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা যায় আর ভাষা সাহিত্য ও ইতিহাসকে টিকিয়ে রাখে।

ইউনেস্কোর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বের ২ হাজার ভাষা হারিয়ে যাবে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০২২-৩২ সময়কালকে 'আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ভাষা দশক' পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এটার মূল উদ্দেশ্যই হলো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাগুলোকে টিকিয়ে রাখা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভাষার অধিকার রক্ষা করা সবার সমান দায়িত্ব।

বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষার প্রসার বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছয়টি ভাষায় বই ছাপিয়েছে, তবে বাংলাদেশে ১৪টি ভাষাকে বিলুপ্তপ্রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এটা ভাষার জন্য নেতিবাচক।

ভাষায় আমরা টিকে থাকি, মনের চাহিদা মিটাই, সাহিত্য রচনা করি। এভাবেই যদি টিকে থাকতে না পারি, তবে ইতিহাস মুখ থুবড়ে পড়বে।

ভাষার বিকল্প ভাষা থাকলেও মাতৃভাষার তো বিকল্প নেই। সবাই যদি এগিয়ে আসে প্রতিষ্ঠানগুলোর সুদৃষ্টিতে, প্রশিক্ষিত শিক্ষকরা থাকলে সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের সুখের হাসিতে আমরা বাংলাদেশ হাসব। ■

*উপপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর*

## শিশু

### সুষমা ফাল্গুনী

ওরা শিশু ওরা কুড়ি
নিষ্পাপ অঙ্গ পবিত্র
ফুটবে ফুল থোকা থোকা
ছড়াবে সুবাস সর্বত্র।
অশুভ আর অকল্যাণের পথে
পা বাড়ালে কেউ
রুখবে তাদের, নতুন দিশার
দেখাবে আলোর ঢেউ।
অসহায়ের সহায় হবে
আঁধারে দিনমনি
সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশের
তারাই শিরোমনি।

গল্প

# রাসেলের সাইকেল

কুমার প্রীতীশ বল

প্রতিদিন রাস্তায় এখন মিছিল আর মিছিল। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সব বন্ধ। মিছিল দেখে দেখে রাসেলের সময় কাটে। বাড়িতে-গাড়িতে-অফিসে-অফিসে পতপত করে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। গাঢ় সবুজ রঙের জমিনের মাঝখান বরাবর লাল রঙের একটা গোলাকার বৃত্ত, এর মধ্যে হলুদ রঙের মানচিত্র।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন একটি পতাকা ৩২ নম্বর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উত্তোলন করেন।

রাসেল বাংলাদেশের একটা পতাকা নিজের সাইকেলটাতে লাগিয়ে বনবন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে লনে, ছাদে,বারান্দায়।

রাস্তায় মানুষের মুখে মুখে স্লোগান-

*জয় বাংলা*

*তুমি কে আমি কে বাঙালি, বাঙালি*

*তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।*

রাসেল সেই স্লোগানের সঙ্গে গলা মিলায়। বঙ্গবন্ধু দূর থেকে রাসেলের এসব কাণ্ডকারখানা দেখে গোঁফের ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে হাসেন আর ভাবেন। বঙ্গবন্ধু আপন মনে বলেন, বাঙালিকে আর ওরা দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

বাঙালিকে ওরা দাবিয়ে রাখতে পারেনি।

সেদিন রাতে রাসেল ঘুমিয়ে ছিল। বঙ্গবন্ধু ঘুমন্ত রাসেলকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। ঘুমের মধ্যে দুধ খাচ্ছে বলে বঙ্গবন্ধু বোতলটি ধরে আছেন আর ঘুমন্ত রাসেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

চারিদিকে বৃষ্টির গুলি হচ্ছে। একটি গুলি এসে পড়ে রাসেলের পায়ের কাছে। প্রথমে বুঝতে পারেননি ওটা কী জিনিস। বঙ্গবন্ধু হাতে নিয়ে আঁতকে ওঠেন।

আতঙ্কিত হয়ে বঙ্গবন্ধু চিৎকার করে বললেন, এ যে বুলেট!

তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বঙ্গবন্ধু তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে রাসেলকে মেঝেতে নামিয়ে নিয়ে আসেন।

গুলির শব্দে রাসেলের ঘুম ভেঙে যায়। মা সবাইকে নিয়ে ড্রেসিং রুমে চলে আসেন। রাসেল হতচকিত হয়ে যায়। মা ওকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যান।

বঙ্গবন্ধু বেড রুমের দরজায় এসে সজোড়ে ধমক দিয়ে বললেন, স্টপ ফায়ারিং।

গুলির শব্দ বন্ধ হয়ে যায়।

আর্মিরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

রাসেলকে নিয়ে মা আর জামাল ভাই পাশের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। কামাল ভাই আরেক বাসায় চলে যায়। ওখান থেকে তিনি যুদ্ধে চলে যান। রাসেল এসবের কিছুই বুঝল না। তবে, আব্বাকে গ্রেফতারের খবর শুনেছে।

রাসেল মাকে বলল, বাসায় যাব। এখানে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না।

মা বলল, ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে না।

রাসেল বলল, আমার সাইকেলটা আনিয়ে নাও।

মা বলল, বাড়িতে ফিরলে সাইকেল চালাতে পারবে। কারফিউ চলছে। কারফিউ চললে ঘরের বাইরে যাওয়া যায় না।

বেগম মুজিবকে পাকিস্তানি আর্মি গ্রেফতার করে। সে সঙ্গে রাসেলও বন্দি হয়। সেই বন্দি জীবন ছিল অনেক কষ্টের। খাওয়াদাওয়া ঠিক মতো পায় না। কোথাও বের হতেও পারে না। কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারে না। রাসেল ভাবে, আব্বাকে এভাবে দিনের পর দিন কাটাতে হয়। এখনও কেউ বলতে পারে না আব্বা কোথায়?

রাসেলের মন খারাপ হয় আব্বার কথা মনে পড়াতে। রাসেলের আরো একটা কারণে মন খারাপ। সে তার সাইকেলটা চালাতে পারছে না।

রাসেল এই মন খারাপের কথা কাউকে বলতে পারে না। কাকে বলবে?

কামাল ভাই শুরুতেই যুদ্ধে চলে গেছেন। জামাল ভাই কয়েকদিন অপেক্ষা করেছে। তারপর সেও যুদ্ধে চলে গেছে। কখনও কখনও চোখ ফেটে কান্না আসে। চোখের কোনায় পানি জমা হয়ে আছে।

হাসু আপু জানতে চাইল, কী হয়েছে রাসেল? চোখে পানি কেন?

রাসেল এতদিনে মনের কষ্টগুলো লুকাতে শিখে গেছে। সে বলল, চোখে ময়লা পড়েছে।

রাসেলের ছোটোবেলার সাথি রমা। ওদের সঙ্গে বন্দি জীবনযাপন করছে। এখন আর ওর সঙ্গেও খেলতে ইচ্ছে করে না। কী দিয়ে খেলবে? সাইকেলখানা নেই। রাসেল মায়ের সঙ্গে এক বাড়িতে বন্দি। সাইকেল আরেক বাড়িতে।

মন খারাপ নিয়ে রাসেলের দিন কাটে। রাত ভোর হয়। হাসু আপার ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম রাখা হয়েছে জয়।

জয় আসাতে রাসেলের মন কিছুটা ভালো হয়। সময় কাটানোর মতো কিছু একটা পেয়েছে। রাসেল সারা সময় জয়ের কাছে থাকে। ওর ভালোমন্দের খবর রাখে। যুদ্ধের মতো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাসেলের জয়কে নিয়ে যত চিন্তা।

চিন্তার একটা কারণ আছে। তাদের বাসার ছাদে পাকিস্তানি আর্মি বাঙ্কার করছে। যখন-তখন বৃষ্টির মতো মেশিন গানের গুলি ছুঁড়ে। প্রচণ্ড গুলির শব্দে জয় কেঁপে কেঁপে ওঠে। কান্না করে। বিছানায় শুয়ে থাকতে চায় না। রাসেল তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

শেষদিকে এসে পাকিস্তান এয়ার রেইড শুরু করে। তখন আক্রমণের সময় সাইরেন বাজিয়ে অরো বেশি

ভয়ের সঞ্চার করত। রাসেল সাইরেন বেজে উঠতেই সর্তক হয়ে যেত। তাড়াতাড়ি দুই পোটলা তুলা নিয়ে জয়ের কানে গুঁজে দিত। আকাশে মেঘের গর্জন হলেও তাই করত।

হাসু আপা বলল, তুমিও তোমার কানে দুটি পোটলা গুঁজে দাও।

রাসেল পকেটে সবসময় তুলা রাখত। পকেট থেকে বের করে নিজের কানে গুঁজে দিত।

ছাদের বাঙ্কারে আর্মিরা অবসর সময়ে নানান ধরনের অস্ত্র পরিষ্কার করত। রাসেল জানালার ধারে বসে বসে ওসব দেখত। তখন ওদের কাছ থেকে কয়েকটি অস্ত্রের নাম শিখে ফেলে।

আর্মিরা সবসময় ছাদে বাইরে ঘোরাফেরা করত। ঘর থেকে তখন কেউ বের হতো না। এয়ার রেইডের সময়ে আর্মিরা বাঙ্কারে ঢুকে যেত। সবাই এ সময় বারান্দায় বেরিয়ে আসত। আকাশে যুদ্ধ বিমানের ডগ ফাইট দেখত। আকাশে বিমান উড়তে দেখলে রাসেল খুব খুশি হতো। খুশিতে হাততালি দিত।

রাসেল ভাবত, এসব বুঝি ভারতীয় বিমান। ভারতীয় বিমান আসলে পাকিস্তানিদের পরাজিত করতে পারবে। তারপর আব্বা ফিরে আসবে।

রাসেলের পাকিস্তানিদের এমনিতে অপছন্দ। আব্বাকে তুলে নিয়ে গেছে। রাতদিন অকারণে গোলাগুলি করাতে জয়কে বিছানায় শোয়াতে কষ্ট হয়। এজন্য আরো বেশি অপছন্দ করা শুরু করল। ওদের পরাজয় কামনা করত।

রাসেলের পানির পিপাসা পেয়েছে। মায়ের মন-মেজাজ খারাপ দেখে আর বলল না। ঘুমাতে চলে গেল। কিন্তু ঘুম এল না। সে অন্ধকারের মধ্যে ঘড়ির টিকটিক শব্দগুলো শুনতে পায়।

নানান কিছু মনে আসে। বাবার কথা। বাবা কোথায় জানে না। কামাল ভাই, জামাল ভাই সবার কথা মনে পড়ে।

রাসেল সবকিছুর মধ্যে সখের সাইকেলটাকে ভুলতে পারে না। রাসেল সাইকেলটা পেতে চায়। সাইকেলের পেছনে বসিয়ে জয়কে ঘুরাবে।

রাসেল হঠাৎ সাইকেলের বেলের টুন টুন আওয়াজ শুনতে পেল। রাসেল কান খাড়া করে আওয়াজটা আবার শুনে। মাথার কাছে জানালা। বাইরে জানালার কাছে কেউ একজন রাসেলের সাইকেলটা নিয়ে এসেছে।

কে আনবে?

তখন কেউ একজন ফিসফিসিয়ে ডাকল, রা-সে-ল...

রা-সে-ল।

নাসের কাকার গলা বলে মনে হলো। এত রাতে নাসের কাকা কেন ডাকছে?

রাসেল ভাবল, দিনে আর্মির কারণে আসতে পারে না। তাই রাতে এসে সাইকেলটা দিয়ে গেল বোধ হয়।

রাসেল ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে।

বাইরে এসে কাউকে দেখতে পেল না। শুধু সাইকেলটা জানালার সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখা।

রাসেল এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। তারপর সাইকেলের কাছে ছুটে যায়। সাইকেলটাকে জড়িয়ে ধরে। অনেকদিন পর দেখা। রাসেলের চোখে পানি চলে আসে।

রাসেল সাইকেলে উঠে বসে। কিছু করার আগেই সাইকেলটা চলতে থাকে। সাইকেল তো নয় যেন পঙ্খিরাজ। রাসেলকে নিয়ে সাইকেল অনেক উপরে উঠে যায়। সাইকেল ওকে নিয়ে অনেক দূরে চলে যায়। রাসেল নিচে তাকিয়ে দেখে সবুজ ঘন বন। বনের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী।

সাইকেল রাসেলকে প্রশ্ন করল, কোথায় যেতে চাও?

রাসেল বলল, আব্বার কাছে?

সাইকেল বলল, তোমার আব্বাকে ওরা পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রেখেছে। মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে।

রাসেল আর্তনাদ করে ওঠে, আব্বাকে মেরে ফেলবে?

সাইকেল বলল, না, মারবে না। বিশ্ববাসী তোমার আব্বার মুক্তি দাবি করেছে। তোমার আব্বার কিছু করতে পারবে না।

রাসেলের হু-হু করে কান্না আসে। সাইকেলটা ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে আসে। সেই সবুজ ঘন বন তখনও শেষ হয়নি। শেষ হয়নি নদীর কূল-কূল ছন্দে বয়ে চলা। সাইকেলটা যেখানে থামে, ওখানে ঘন সবুজ ঘাসের চিকন চিকন সতেজ ডগা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু এগুলে ঘন কাশবন।

বুকের ভেতরের সেই শূন্যতা তখনও কাটেনি। রাসেল নদীর পাড়ে খানিকক্ষণ জিড়িয়ে নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙতেই দেখল সাইকেল নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজে। কিন্তু কোথাও তা খুঁজে পায় না। রাসেল কী করবে ভেবে পায় না। তাই সে নদীর পাড়ে বসে কাঁদতে থাকে।

কান্না শুনে অপর পাড় থেকে একটা নৌকার মাঝি রাসেলের কাছে আসে। মাঝি কান্নার কারণ জানতে চায়। রাসেল তখন সবকিছু খুলে বলে। রাসেলের কথায় মাঝির মায়া হয়।

মাঝি বলল, অপেক্ষা করো। আমি তোমার সাইকেল এনে দিচ্ছি।

এই বলে মাঝি চলে যায়।

কিছুক্ষণ পর মাঝি দুটো সাইকেল নিয়ে হাজির হলো। একটা মপেট মটর সাইকেল। অপরটি সাধারণ সাইকেল, মানে ওর সাইকেলটা।

মাঝি মোপেড মোটর সাইকেলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নাও তোমার সাইকেল।

রাসেল ওটা দেখে বলল, এটা ? না এটা আমার সাইকেল না।

মাঝি বলল, এটা তোমার সাইকেলের চেয়ে দামি।

রাসেল বলল, আমার সাইকেল এমন না।

মাঝি রাসেলকে তার আসল সাইকেলটা দেখালো।

রাসেল বলল, হ্যাঁ, এটাই আমার সাইকেল।

মাঝি খুশি হয়ে দুটো সাইকেলই রাসেলকে দিয়ে দিল। বলল, মোপেড সাইকেলটা তোমার সততার পুরষ্কার। তুমি এখন বাড়ি ফিরে যাও।

পরদিন ভোরে বাড়ির বারান্দায় হইচইতে রাসেলের ঘুম ভাঙে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। একদিকে আনন্দ, আরেকদিকে দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা আব্বার জন্য।

অবশেষে, আব্বা ফিরে আসেন। রাসেলের খুশির সীমা রইল না। তারপর সে একমুহূর্তও আব্বাকে ছাড়া থাকতে চাইত না।

তখন রাসেলের জন্য অনেক খেলনা কেনা হলো। সেসব খেলনার সঙ্গে একটা ছোট্ট মোপেড মটর সাইকেলও কেনা হলো। ■

---

*শিশু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক*

# শিশুর জীবন হোক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময়

নুসরাত জাহান

আজকের শিশু হচ্ছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রত্যেক বাবা-মায়ের অবশ্য কর্তব্য।

সম্প্রতি ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ১৩-২৯ বছর বয়সি কিশোর-যুবকদের ওপর ইউনিসেফের একটি জরিপে দেখা যায় যে, কোভিড-১৯ তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এর মধ্যে উদ্বেগ, বিষণ্নতা, কাজে মনোযোগহীনতা বা আগ্রহ বোধ না করা, হতাশা, স্ট্রেস অনুভব করা ইত্যাদি প্রধান। আমাদের শিশু-কিশোররা কীভাবে তাদের সময়কে আনন্দময় করতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের তৈরি করতে পারে, সে লক্ষ্যে আমাদের প্রয়োজন বিশেষ সচেতনতা। এজন্য আমরা যা যা করতে পারি তার কিছু উপায় দেওয়া হলো–

**রুটিন মেনে ছন্দময় জীবন:** সকালে ঘুম হতে ওঠা থেকে রাতে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত রুটিন মেনে নিজেকে কর্মব্যস্ত রাখতে হবে। যার জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সংগতিপূর্ণ নতুন একটি রুটিন ঠিক করে নিতে হবে।

**প্রতিদিন সকালে নিজের বিছানা নিজে গুছানো:** সকালে নিজের বিছানা নিজে গোছানোর মানে দিনের প্রথম কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করা, যা উৎসাহ জোগাবে দিনের পরবর্তী কাজগুলো সঠিকভাবে করার।

**সঠিক ব্যায়াম চর্চা:** ছোটোবেলা থেকেই সঠিক ব্যায়াম চর্চা করলে সন্তানের দেহ কাঠামো সুগঠিত হবে, হরমোন প্রবাহ স্বাভাবিক থাকবে। তাই শরীর চর্চাকে দৈনন্দিন জীবনাচারে পরিণত করলে শরীর-মনের জন্যে বেশ কল্যাণকর হবে। শরীরচর্চা মানে শুধু ব্যায়াম নয়। সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা কিংবা দৌড়ের মতো অভ্যাসও ব্যায়ামের সমান কার্যকর।

**নতুন ভাষা শেখা:** অলস সময় ফুর্তিতে পার করার আরেকটি অন্যতম উপায় হতে পারে নতুন কোনো ভাষা শেখা। এখন অনলাইনে সহজেই বিনামূল্যে ভাষা শিখার নানা কোর্স করা যায়। বিশ্বব্যাপী একাধিক ভাষার দক্ষতা থাকা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয় কর্মক্ষেত্রে।

**বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখা:** বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ ও খেলাধুলা দুটোই শিশুর জন্য প্রয়োজন। তাই এ ব্যাপারে বাবা-মাকে সতর্ক থাকতে হবে।

**বাগান করা:** শহরে ছাদ-কৃষি বা বাগান করা হতে পারে একটি আনন্দদায়ক কাজ। আর শিশু-কিশোররা এ ব্যাপারে বাবা-মাকেও সাহায্য করতে পারে।

**বিভিন্ন কুইজ/পাজল সমাধান করা:** শব্দ-জব্দ ধাঁধা, সুডোকু, কুইজের সমাধানের নিয়মিত চর্চা শিশু-কিশোরদের জন্যে হতে পারে সময় কাটানোর দারুণ এক উপকরণ।

**সৃজনশীল প্রতিযোগীতায় অংশ নেওয়া:** মেধা বিকাশের জন্যে এখন স্থানীয়, জাতীয়,আন্তর্জাতিকভাবে নানান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে অনলাইন ও অফলাইনে। গণিত অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড বিষয়ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা,গান, কবিতা আবৃত্তি, গল্প লেখা ও বলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ শিশুদের জন্য হতে পারে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা।

সর্বোপরি এ ব্যাপারে অভিভাবকদের হতে হবে রোল-মডেল। মমতা ও সঠিক দিক-নির্দেশনা দেখাতে পারে নতুন শুরুর পথ। ■

*সম্পাদক, নবারুণ*

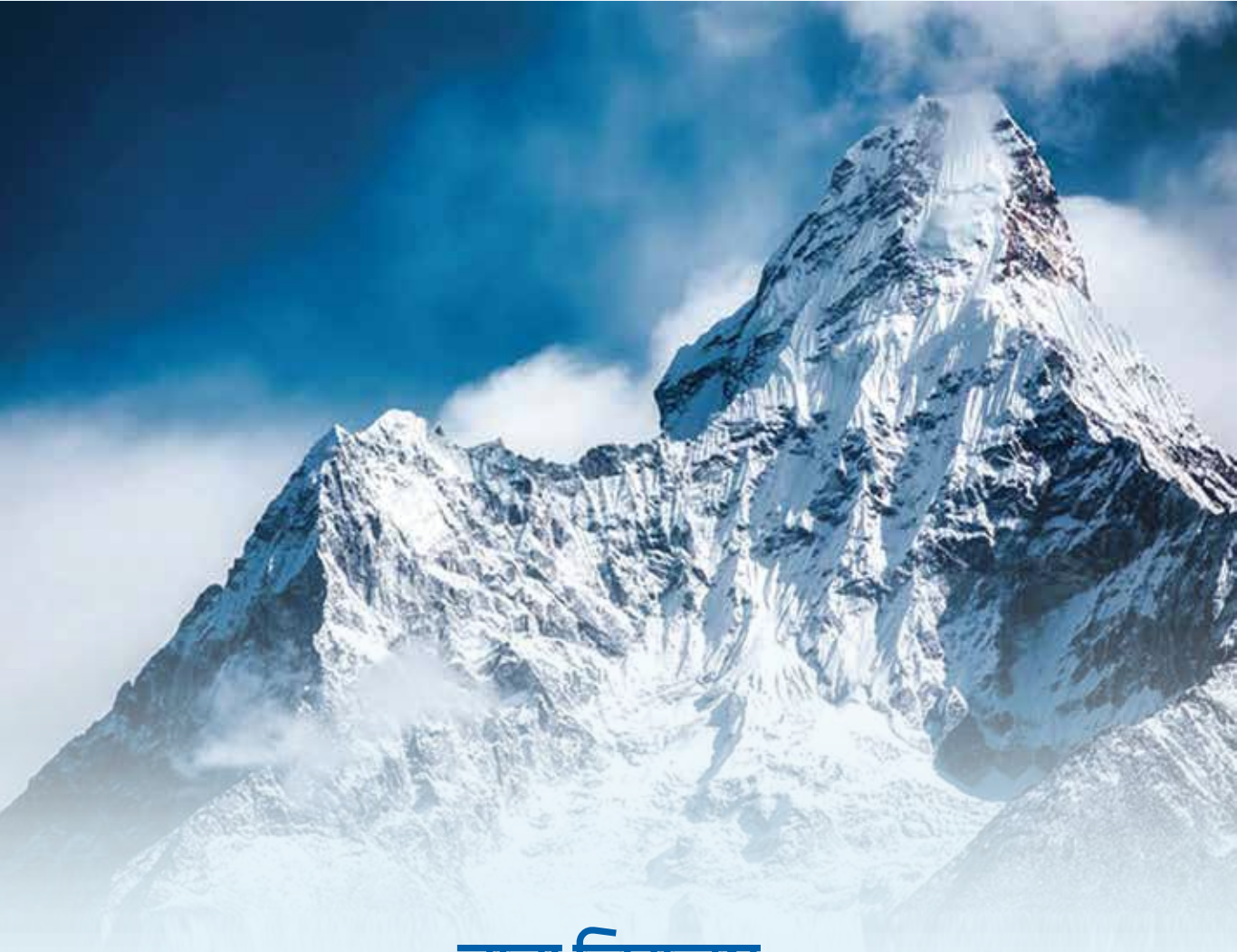

# বাবা হিমালয় মেয়ে পদ্মার রূপকথা

নাসরীন মুস্তাফা

অনেক অনেক দিন আগে শুরু হওয়া এক রূপকথার গল্প বলছি। রূপকথার গল্পটা এখনো চলছে। এই গল্পে আমি আছি। তুমি আছো। আমাদের সময়ের আমরা সবাই আছি। কাজেই গল্পটা আমাদের।

আমাদের এই রূপকথার গল্পে এক রাজাও আছেন । সেই রাজা একজন বাবাও।

বাবা হিমালয় পর্বত রাজ। রাজা পর্বত। পর্বতদের রাজা তিনি। আকাশ ফুঁড়ে মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকেন। একদম চুপ। কথা বলেন না। ভাবেন। কেবলই ভাবেন।

কথা তিনি একদমই বলেন না, তা কিন্তু নয়। কখন বলেন জানতে চাও? যখন তার আদরের মেয়ে তাঁকে ডাকে। বাবা বলে ডাকে।

পর্বত রাজের বুকের ভেতর হিম বরফ। হিম মানে কী, তুমি তো জানো। হিম মানে ঠান্ডা। শীত ধরিয়ে দেওয়া ঠান্ডা। খুব ঠান্ডা। পর্বত রাজের নাম তাই হিমালয়। হিমের আলয় হিমালয়। আলয় মানে বাড়ি। পর্বত রাজের বুকে হিমের বাড়ি। তাই তিনি হিমালয়।

বোঝো তবে, কত ঠান্ডা রাজার বুক! অথচ এই ঠান্ডা বুকেই জাদু ঘটল। বুকের ভেতরে একদিন কে যেন

ডেকে উঠেছিল। ডেকেছিল বাবা বলে।

বাবা ডাকে কী যে জাদু ছিল! বুকের বরফ গলে গেল বাবার। গলে যাওয়া বরফ হয়ে গেল নদী। বুকে পানির ঢেউ। ভালোবাসার ঢেউ। গানের সুরে নাচতে নাচতে বয়ে চলে।

বাবা তো! তাই আকুল হয়ে ডাকেন, বুকে আয় মা। দূরে যাসনে। পথ হারিয়ে ফেলবি তো!

মেয়ে আর থামে কীভাবে? ও তো নদী। ওর কাজ কেবলই বয়ে চলা। উঁচু থেকে নিচে, আরো নিচে পথ চলা ওর। চলতে চলতে খুঁজে ফেরা সাগরকে। একবার যেই সাগরকে পেয়ে যায়, তখন, সাগরের সাথে মিলে যায় নদী।

যতদূরেই যাক না কেন, মন চাইলেই মেয়ে ডেকে ওঠে, বাবা!

যতদূর থেকেই ডাকুক না কেন, মেয়ে ডাকলে বাবা কি না শুনে পারেন?

রাজা হিমালয় ডাক শুনলেন। চোখ খুললেন। নিচে তাকাতেই দেখেন মেয়েকে। সরু ফিতের মতো বয়ে চলেছে। অনেক উপর থেকে দেখলে সরু ফিতেই মনে হয়।

বাবার বুকে ভালোবাসা। ওরে আমার ছোট্ট মেয়েটা!

মেয়ে হাসে কলকল। বলে, বাবা! তুমি আমাকে ছোট্ট বলছ? আমার পাড়ে বাস করে মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা। ওরা জানে আমি নদীটা অনেক অনেক বড়ো।

বাবা মুচকি হাসেন। বাবার কাছে মেয়ে সবসময়ই ছোট্ট।

মেয়েটা জন্মের পর পর্বত রাজের প্রজারা খুশি হয়েছিল খুব। এই নদীর পানি তাদের অনেক উপকারে এল। প্রজারা সাধারণ মানুষ। তাদের গায়ের রং মাটির মতো কালো। মাথার চুল কোঁকড়া। নাক বোঁচা থ্যাবড়ানো।

দূর দেশ থেকে এসেছিল আর্য সেনারা। লম্বা-চওড়া মানুষ। গায়ের রং দুধে আলতা। নাক সরু, ঈগল পাখির ঠোঁটের মতো। এসেছিল ঘোড়ায় চড়ে। এই ঘোড়া প্রজারা আগে কখনো দেখেনি। এবার দেখে অবাক হলো, ভয় পেল।

ঘোড়াকে বশ মানাতে পারা আর্য সেনাদের দেখেও অবাক হলো। ভয় পেল। আর্যরা বলল, আমরা রাজা। তোমরা আমাদের কথা মেনে চলবে। আমাদের সেবা করবে।

ব্যাস, উড়ে এসে জুড়ে বসা আর্যরা রাজা বনে গেল। প্রজাদের অনেকে বশ মানল। অনেকে বলল, এ মাটি আমাদের। বিদেশিদের আমরা মানব না।

যারা মানল না, রাজার সেনারা তাদের বিপদে ফেলল। এরা তখন নদীর পাড় ধরে সরে যেতে লাগল দূরে। অনেক দূরে। সেখানে জমিন অনেক ঢালুতে। নদীও বয়ে চলে নীচুতে। এগিয়ে যায় সাগরের খোঁজে।

আর্য রাজা নাম দিয়েছিল নদীর। গঙ্গা।

বাবা হিমালয়কে মেয়ে সেই নাম বলে। গঙ্গা।

গঙ্গার পানি কত কাজে লাগে। তাই প্রজারা আগে থেকেই নদীকে ভালোবাসত। ঢালুতে নেমে আসা নদীকে সেই দূরে চলে যাওয়া প্রজারা নাম দিয়েছিল পদ্মা। লক্ষ্মী পদ্মা।

এই ঢালু জমিনের নাম পূর্ব বাংলা। পূর্ব বাংলার বুক চিরে বয়ে চলি আমি। নতুন নাম নিয়ে। মিষ্টি হেসে বাবাকে বলে মেয়ে। এরপর একটু রেগে যায়। কেন রেগে যায়?

বাবা বলেন, মা! সব ঠিক তো?

ঠিক নেই বাবা। আর্য রাজা গঙ্গার পাড়ে বাস করেন। তাই বলেন, গঙ্গার অনেক মান। অনেক সম্মান। ওহে, জেনে রেখো, গঙ্গা বড়ো পবিত্র।

জানলাম। রাগটা কেন, সেটা তো বলবি।

পদ্মার পাড়ে কালো মাটির বাঙালির বাস। তাই পদ্মা নাকি পবিত্র না। ভেবে দেখো বাবা। একই নদী আমি গঙ্গা আর পদ্মা। গঙ্গা পবিত্র। পদ্মা কেন পবিত্র নয়?

আসলেই। ভাববারই কথা বটে। আর মেয়েটা যে রেগে ফুঁসে উঠছে, তাতে তো বাবার ভাবনা আরো বাড়ছে। মেয়েটা রাগবেই বা না কেন? এসব কথা শুনলে রাগতে হয়।

এরপর পূর্ব বাংলার ভাটির মাটির কথা বলি। নিচে নামতে নামতে সাগরের কাছে যাচ্ছে। নদীও তাই। যত নিচের দিকে পড়ে, তাতে নদীতে স্রোত বাড়ে।

স্রোতের গতি বাড়ে। পদ্মার তখন নিজেকে দেখেই নিজের ভয় লাগে। কিছুতেই থামতে পারে না। পাড় ভাঙতে ভাঙতে এগুতে থাকে। নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা মানুষের ঘরবাড়ি গাছপালা সব ভেঙে দেয়। টেনে নেয় নদীর ভেতর।

বাবা হিমালয় মন খারাপ করে থাকেন। কথা বলেন না। কষ্ট হচ্ছে খুব।

মেয়ে বলে, তারপরও অবাক হই বাবা। আমি সব ভেঙে দেই। পদ্মা পাড়ের মানুষগুলো আবার সব গড়ে তোলে। আমি আবার ভাঙি, ওরা আবার গড়ে। যতবার ভাঙি, ততবার গড়ে। গড়তে গড়তে গান গায়। অথবা গান গাইতে গাইতে গড়ে।

বলিস কী! বাবা অবাক। খুব অবাক।

মেয়ে গুনগুন করে গেয়ে ওঠে গান। সর্বনাশা পদ্মা নদী, তোর কাছে শুধাই...

লক্ষ্মী পদ্মাকে, তার ছোট্ট মেয়েটাকে ওরা সর্বনাশা বলে ডাকছে! বাবার মনটা খারাপ হয়। খুব খারাপ।

মেয়ে হাসে কলকল। বলে, ওদের সর্বনাশ যে করে, তাকে সর্বনাশাই তো বলবে বাবা। আমাকে কীর্তিনাশাও বলে।

সে কী! তবে এই নামটি আমার পছন্দের। আমি গর্ববোধ করি কীর্তিনাশা নাম নিয়ে।

কেন কেন?

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করেছিল বিদেশি ইংরেজরা। ষড়যন্ত্র করে দখল নিয়েছিল বাংলার। এই ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছিল বাংলার কিছু বাজে লোক। রাজা রাজবল্লভ ছিল এদের একজন। এই রাজার রাজত্ব ছিল বিক্রমপুরে। আমি খুব রাগে ভেঙে দিয়েছিলাম রাজা রাজবল্লভের সব কীর্তি। প্রাসাদ, নগর সব। সেই থেকে আমি কীর্তিনাশা। ষড়যন্ত্রকারীর কীর্তি নষ্ট করেছি। এতে আমি খুশি।

মেয়ের হাসি দেখে বাবাও হাসেন। মুচকি হাসি। পর্বতরাজের হাসি বলে কথা। হাসির রেশ থামতে কেটে যায় অনেক অনেক অনেক অনেক অনেক দিন। এরপর জানতে চান, স্বাধীন বাংলা পরাধীন হয়েছিল। সেই স্বাধীনতা বাংলা কি ফিরে পায়নি আর?

এই প্রশ্নের জবাব জানতে গিয়ে পর্বতরাজ হিমালয় জানতে পারেন আরেক হিমালয়ের কথা। তার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি তাঁকে বন্ধু মেনেছিল। তিনি বাঙালির বন্ধু। বাংলার বন্ধু। বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই পৃথিবীর আরেক বড়ো নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বঙ্গবন্ধুকে দেখে

বলেছিলেন, আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি। আমি আপনাকে দেখেছি। এতেই আমি খুশি।

মেয়ে বলে, বুঝেছ বাবা? হিমালয় পর্বতের মতোন বিশাল এক মানুষ। আসলে তার মনটা ছিল বিশাল। বাংলাকে ভালোবাসতেন। বাঙালিকে ভালোবাসতেন। হাজার বছর ধরে বাঙালি সম্মান পায়নি। অধিকার পায়নি। কেবল ঠকেছে। তিনি তাদের বুঝিয়েছেন সেসব। শিখিয়েছেন প্রতিবাদ করতে হয়। প্রতিবাদী বাঙালি হিমালয়ের মতোন মানুষটাকে নেতা মেনেছিল। তার নেতৃত্বে মরণপণ যুদ্ধ করেছিল। বাংলার মাটি থেকে তাড়িয়েছিল বিদেশিদের। বাংলা এখন স্বাধীন দেশ। এই দেশের নাম বাংলাদেশ।

বাহ! পদ্মা এখন স্বাধীন দেশের নদী। এতে কি পদ্মার রাগ কমেছে?

চুপ হয়ে যায় মেয়ে। মন খারাপ খুব। বাবা জানতে চান, কেন মন খারাপ? বারবার জানতে চান। মেয়ে বলে না কিছু। অনেক অনেক অনেকক্ষণ পর বলে, স্বাধীন দেশেও রাজা রাজবল্লভের মতো ষড়যন্ত্রকারী ছিল। ঘাপটি মেরে ছিল। এরা বাঙালির স্বাধীনতা মেনে নিতে চায়নি। এদের কাছে বিদেশি প্রভুরাই ভালো। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এই রাগ বিদেশি প্রভুদের। ষড়যন্ত্রকারীদের কাজে লাগালো বিদেশিরা। রাতের অন্ধকারে এরা আঘাত হানল হিমালয়ের মতো সেই মানুষটির বুকে। নিহত হলেন নেতা। মহান নেতা বঙ্গবন্ধু। সেই রাতে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধুর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য। তার দশ বছরের ছোট্ট ছেলেটিকেও রেহাই দেয়নি ঘাতকের দল।

এরপর আর কথা হয় না। বাবা চুপ। আর মেয়ে রাগে গর্জন করতে থাকে। সে গর্জনে কেঁপে ওঠে আকাশ। কাঁপতে থাকে দুই পাড়ের ঘরবাড়ি, গাছপালা, পশুপাখি- সবকিছু।

বাবা আর কিছু জানতে চান না। রেগে ফুঁসে ওঠা পদ্মাকে শান্ত করা যাবে না, বুঝে ফেলেন। কিন্তু মেয়েটা শান্ত হয়। বাবাকে অবাক করে দিয়ে হেসে ওঠে কলকল।

কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?

মেয়ে বলে, তোমাকে বঙ্গবন্ধুর মেয়ের কথা বলি বাবা।

বঙ্গবন্ধুর মেয়ে!

ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়েকে মারতে পারেনি। তারা ছিলেন বিদেশে। বড়ো মেয়েটার নাম শেখ হাসিনা। তিনি ফিরে এলেন বাংলাদেশে। ধরলেন দেশের হাল। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়ালো। দেশের মানুষকে ভালো রাখতেই হবে। এই সেই মেয়ের পণ।

পর্বত রাজ হিমালয়ের খুব ভালো লাগে শুনতে। এই না হলে মেয়ে! বাবার মেয়ে।

দেশের মানুষকে ভালো রাখার জন্যই মেয়েটা পদ্মা নদীর কথা ভাবলেন। এই নদী কেন কেবলই দুঃখের কারণ হবে? নদীর বাতাসে কেন ভেসে বেড়াবে মানুষের কান্না?

সত্যিই তো! মানুষ কাঁদে। নদীর পাড় ভাঙে। মানুষ কাঁদে। নদী পার হতে গিয়ে ডুবে যায় মানুষ। তখনো কাঁদে। নদী পার হতে না পেরে ক্ষতি হয় মানুষের। কাঁদে মানুষ। কত কান্না জমে আছে পদ্মা নদীর বুকে!

বাবা হিমালয় কান পেতে শোনেন। মানুষের কান্না গানের সুর হয়ে কাঁদছে। মন খারাপ হয়ে যায় সেই সুরে। ভালো লাগে না।

মেয়েও কাঁদে। তবে এ কান্না আনন্দের। ভেজা কণ্ঠে বলে, জানো বাবা! বঙ্গবন্ধুর মেয়েটা অনেক মমতা দিয়ে আমার কথা ভাবলেন। তিনি আমার বুকে সেতু গড়তে চাইলেন।

সেতু দিয়ে পার হবে মানুষ। চটজলদি, বিপদ ছাড়াই পার হবে। আহা!

আমার দুই পাড় আদর করে বেঁধে দিতে চাইলেন, যাতে আর না ভাঙে।

সাব্বাশ!

এরপর দুই পাড়ে গড়ে তুলতে চাইলেন অনেক অনেক কিছু। আধুনিক শহর, কলকারখানা, খেলার মাঠ, মানমন্দির, ইকোপার্ক -এরকম অনেক কিছু। যাতে সাধারণ মানুষ কাজ করে খেতে পারে। মনের খুশিতে চলতে পারে। ব্যাবসা করতে পারে।

পদ্মা নদীকে ঘিরে এই দারুণ স্বপ্ন বাবা হিমালয়কে

মুগ্ধ করে দেয়। মেয়েকে বলেন, সভ্যতা গড়ে ওঠে নদীকে ঘিরে। পদ্মা নদীকে ঘিরে নতুন দিনের নতুন সভ্যতা গড়ে উঠতে যাচ্ছে। কী যে ভালো লাগছে শুনে!

বদলে যাবে দিন।

ঠিক। বদলে যাবে দিন। আর এ কারণেই দেশের শত্রুরা ষড়যন্ত্র শুরু করল। তারা পদ্মা সেতু হতে দেবে না। পদ্মা নদীকে নিয়ে দেখতে দেবে না স্বপ্ন। যেন পদ্মা এখনো অনার্য নদী, অনার্য সাধারণ মানুষের নদী। তাই তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা যাবে না। এতে যদি সাধারণ মানুষের উপকার হয়, তাহলে সর্বনাশ! আর্য বিদেশিরা, ষড়যন্ত্রকারীরা কখনোই চায় না সাধারণ মানুষের উপকার হোক। সাধারণ মানুষ ভালো থাকে। তাহলে যে মানুষ আর তাদের কথা শুনবে না। মানবে না।

সর্বনাশ!

পর্বত রাজের মন খারাপ হয়। স্বপ্ন ভেঙে গেলে কার না মন খারাপ হয়? কিন্তু মেয়ের হাসি শুনে থমকে যান। এরপরও হাসে কেন মেয়ে? ঘটনা কি?

ঘটনা তো সেইরকম। যার বাবা হিমালয়, সেই পদ্মা নদীকে কেউ থামাতে পারে না। হিমালয়ের মতো বিশাল মানুষ বঙ্গবন্ধু যার বাবা, তার মেয়ে শেখ হাসিনাকে কে-ই বা থামাবে? তিনি ঘোষণা দিলেন পদ্মা সেতু হবেই। দেশের টাকায় তিনি গড়ে তুলবেন পদ্মা সেতু। সম্ভব করে তুলবেন পদ্মা নদীকে ঘিরে দেখা সব স্বপ্ন।

মেয়ে হাসে কল কল ছল ছল। এবার বাবার চোখ ভেজে। খুব খুশি হলে না কেঁদে কি পারা যায়?

এরপর?

আমার কথা কিন্তু ফুরোবে না। নটে গাছটাও মুড়োবে না।

আসলে রূপকথার এই গল্পের নতুন শুরু তো কেবল শুরু হলো। পদ্মা নদীকে ঘিরে নতুন যে সভ্যতা গড়ে উঠতে যাচ্ছে, তার সাথে পথে চলবে রূপকথার এই গল্পটা।

অনেক অনেক দিন পর পর্বতরাজ হিমালয় তার মেয়ে পদ্মার সাথে আলাপে আরো কত কথা বলবেন! সব আমি নিজেও জানি না। তবে এই কথাটা যে বলবেন, তা ঠিক ঠিক জানি।

কোন্ কথাটি বলবেন?

বলবেন– হাজার বছর পর বাঙালি জাতিকে স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর হাজার বছর পর বাঙালির নদী পদ্মাকে ঘিরে নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। মানুষের ইতিহাসে এরকম ইতিহাস আর কৈ?

বাঙালির বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে করা সব ষড়যন্ত্র পদ্মা নদীর গভীরে ডুবিয়ে দিয়ে কেবল স্বপ্নকে জাগিয়ে তোলার এরকম ইতিহাস বাঙালি আগে কখনো দেখেনি। ■

---

*শিশু সাহিত্যিক ও সাবেক সম্পাদক, নবারুণ*

# হেমন্তের সোনালি প্রান্তর

এস আই সানী

ঋতু বৈচিত্র্যের এক বিস্ময়কর দেশ বাংলাদেশ। কেউবা এ দেশকে বলেছেন 'রূপময় বাংলাদেশ', কেউবা বলেছেন 'রূপসী বাংলা', আবার কেউ বলেছেন 'সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ'।

পালা করে এ দেশে ছয়টি ঋতুর যাওয়া আসা। এ ঋতুগুলো তাদের স্বভাব অনুযায়ী প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলে বিচিত্র রূপে। কোনোটা প্রকৃতিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, আবার কোনোটা এসে গুঁড়িয়ে যাওয়া প্রকৃতিতে এনে দেয় সজীবতা। কোনো ঋতু হয় ধূসর কিংবা ফ্যাকাসে, আবার কোনো ঋতুর রূপ রঙিন ঝলমলে। প্রকৃতির এমন রঙিন পালা বদল সাধারণত এদেশ ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। তাই তো কেবল এ দেশকেই বলা হয় ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ।

রূপময় বাংলাদেশের ছয়টি ঋতুর মধ্যে হেমন্ত চতুর্থ। কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাস মিলে হেমন্তের গঠন। 'কৃত্তিকা' ও 'আদ্রা' এ দুটি তারার নামানুসারে কার্তিক ও অগ্রহায়ণের নামকরণ করা হয়েছে। বর্ষায় ধুয়ে যাওয়া আকাশে পেজাতুলোর ন্যায় সাদা মেঘের বয়ে যাওয়া এবং নদীতীর জুড়ে সাদা কাশফুলের ঝরে যাওয়ার দিন শেষে হেমন্ত খুব আয়েশে এসে বসে প্রকৃতিতে। প্রকৃতিকে সাজিয়ে দেয় তার আপন রূপের মাধুরীতে। এক এক করে মুছে দিতে থাকে তার সহোদর শরতের স্মৃতিচিহ্ন। এ যেন তার একার রাজত্ব!

একসময় বাংলা সনের শুরু হতো এই হেমন্ত দিয়ে। সম্রাট আকবর বাংলা পঞ্জিকা তৈরির সময় হেমন্তের অগ্রহায়ণকে বছরের প্রথম মাস হিসেবে ঘোষণা করেন। এ মাসে নতুন ফসল ঘরে উঠলে তিনি চাষিদের থেকে খাজনা আদায় করতেন। এটাকে তাই খাজনা আদায়ের মাসও বলা হতো।

হেমন্ত তার নিজস্ব রূপে অনন্য। মাঠে মাঠে বেড়ে ওঠা ফসল যেমন সোনার বরণ ছড়িয়ে দিয়ে চারপাশ ম-ম গন্ধে ভরপুর করে তোলে, তেমনি সবুজ প্রকৃতিকে করে তোলে আরো গাঢ় সবুজ এবং রূপময়। পাকা ধানের শীষে শীষে হিমেল বায়ুর ঢেউ; ফড়িং আর প্রজাপতির নাচানাচি; চড়ুই, বাবুই আর ধানশালিকের কিচিরমিচিরে মুখরিত হয় হেমন্তের মাঠ।

হেমন্তের সুনীল আকাশ বেয়ে সকালের সূর্যটা কাঁচা রোদ ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীতে। সন্ধ্যেটা সাজায় রক্তিম আভায়। এ সময় সারবেঁধে নীড়ে ফেরা পাখিগুলো যখন আকাশ বেয়ে বয়ে চলে, তখন অপরূপ সে দৃশ্য হৃদয় মনে তৃপ্তি আনে। হেমন্তের সন্ধ্যার এমন রূপ শিল্পীর রঙে আঁকা ছবি ভেবে ভুল করে যেন!

অন্যান্য ঋতুর চেয়ে হেমন্তের ধরনটা আলাদা। কার্তিকের দিনগুলোতে তাপমাত্রা একটু বেশি থাকলেও অগ্রহায়ণ তা আস্তে আস্তে প্রশমিত করে। না-গরম, না-শীত। এ দুয়ের সংমিশ্রণ হলো হেমন্ত। বাংলাদেশকে যদি নাতিশীতোষ্ণ দেশ বলা হয়, তবে হেমন্তকে বলা হয় নাতিশীতোষ্ণ ঋতু। এ সময় দুর্বাঘাসের ডগায় ডগায় জমে ওঠা সে শিশিরগুলো যেন মুখ উঁচু করে দেখে ভোরের সূর্যকে। ভোরবেলা শিউলিতলা সুরভিত হয় শুভ্র পাপড়িতে। হেমন্তের অগ্রহায়ণে সন্ধ্যার প্রকৃতিতে হালকা কুয়াশার চাদর টানতেও দেখা যায় অহরহ।

অন্যান্য ঋতুর মতো হেমন্তেও নানা জাতের ফুলে ফুলে সানন্দে নাচানাচি করে দলছুট মৌমাছি আর প্রজাপতিরা। এছাড়া খাল-বিল, নদী-নালা, হাওর-বাঁওড়ে লাল-সাদা শাপলা আর পদ্ম ফুলের নাচন দেখা যায় সগৌরবে।

এ সময় মাথায় চুপড়ি পরে পরম আনন্দে গান গেয়ে চাষিরা ধান কাটে। ধান কাটা শেষ হলে সেগুলো আঁটি বেঁধে শুইয়ে রাখে অগ্রহায়ণের মাঠে। তারপর আসে কাঁধে ভাড় ঝুলিয়ে বয়ে নেওয়ার পালা। কেউ আবার গরুর গাড়িতে করে বহনের কাজটা সারেন। আবার কেউ কেউ বড়ো আঁটি বেঁধে মাথায় করে বয়ে থাকে। আবার হাওর অঞ্চলের মানুষদের বাহন হলো নৌকা।

আবহমানকাল ধরে হেমন্ত নিয়ে আসে উৎসব আর আনন্দমুখর দিন। গাঁয়ে গাঁয়ে রাঙে নতুন ধানের নবান্ন উৎসব। এই উৎসব ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সংস্কৃতি।

# এই হেমন্তে

## আলম শামস

চলে গেল বর্ষাঋতু
উড়িয়ে মেঘকালো,
শরত শেষে শীতল আমেজ
রোদ লাগে যে ভালো।

হেমন্তেরই কোমল পরশ
সবুজ শ্যামল মাঠ,
চোখ জুড়ানো সোনার ফসল
শান্ত নদীর ঘাট।

আকাশেতে সাদা মেঘের
হরেক রকম খেলা,
রোদ মেঘের লুকোচুরি
দেখে কাটে বেলা।

বিলের মাঝে শাপলা শালুক
নতুন নতুন ফুল,
মিফতামনি তুলতে যাবে
বাঁধছে এখন চুল।

শিউলি ফুলের মনমাতানো
ছড়ায় সুবাস গন্ধ,
কবিরা সব লিখতে বসে
খুঁজে বেড়ান ছন্দ।

সকাল বেলা রোদের ঝিলিক
মিষ্টি মধুরআলো,
বিকেল বেলা হিমেল আমেজ
রোদ লাগে যে ভালো।

হিমবাতাসের কোমল পরশ
সবুজ সুন্দর মাঠ,
শিশু-কিশোর শিখতে চায়।
নতুন নতুন পাঠ।

নদী-নালা খালে-বিলে
শুকায় এখন পানি,
জেলেরা সব ধরছে যে মাছ
খুশিতে জাল টানি।

সাধারণত অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হয়ে থাকে এ উৎসব। কেননা এ সময় আমন ধান কেটে ঘরে তোলা হয়। এই নতুন ধানের চাল রান্না উপলক্ষ্যে গ্রাম জুড়ে উৎসব বসে। আগেকার দিনে কোনো কোনো অঞ্চলে ফসল কাটার আগে বিজোড় সংখ্যক ধানের ছড়া কেটে নিয়ে ঘরের চালে বেঁধে রাখা হতো। পরে ক্ষেতের বাকি ধান কাটার পর এ ধান ভেঙে নতুন চালের পায়েস করা হতো। বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসব এখনো হয়।

নবান্ন উৎসবে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় নৃত্য, গানবাজনাসহ আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালন করা হয়। এ ছাড়া সদ্য ধান কাটা অগ্রহায়ণের মাঠে বসে গ্রামীণ লোকজ মেলা। লাঠিখেলা, বাউলগান, নাগরদোলা, বাঁশি, শখের চুড়ি, খৈ, মোয়াসহ প্রভৃতি বিনোদনোপকরণ ও পণ্যের পসরা বসে গ্রাম্য সে মেলায়।

হেমন্ত আর নবান্নের সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে কাজী নজরুল ইসলামের 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায় লিখেছেন–

'ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণীর সওগাত?
নবীন ধানের অঘ্রানে আজি অঘ্রান হ'ল মাৎ।
'গিন্নি-পাগল' চা'লের ফিরনী
তশতরি ভ'রে নবীনা গিন্নি
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত।
শিরনী রাঁধেন বড়ো বিবি, বাড়ী গন্ধে তেলেসমাত!'

হেমন্তকে নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছেন–

'হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে,
হেমন্তিকা করলো গোপন আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।'

কবি সুফিয়া কামাল শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন–

'সবুজপাতার খামের ভেতর
হলুদগাঁদা চিঠি লেখে,
কোন্ পাথারের ওপার থেকে
আনল ডেকে হেমন্তকে?'

মধুর ছড়াটির শেষাংশে তিনি লিখেছেন–

'সকালবেলা শিশিরভেজা
ঘাসের ওপর চলতে গিয়ে,
হালকা মধুর শীতের ছোঁয়ায়
শরীর ওঠে শিরশিরিয়ে।'

যদিও আগের দিনের হেমন্তকে এখন আর পাওয়া যায় না, তবুও হেমন্ত আসে আমাদের মাঝে। কার্তিকের নীল কুয়াশায় মুড়ে হেমন্ত আসে গ্রামবাংলার জনপদে, মাঠ-ঘাট-প্রান্তরে। হেমন্ত এলেই বাংলার মাঠে-প্রান্তরে হলুদ-সোনারঙের বিস্তীর্ণ আস্তরণ তার অমোঘ বিশালতায় সোনালি পালক ছড়িয়ে দেয়। সর্বোপরি, হেমন্ত আসুক প্রতিবছর নিটোলপায়ে হেঁটে হেঁটে এদেশের বিস্তীর্ণ সোনালি প্রান্তরে। রং ছড়াক গ্রামবাংলার প্রতিটি মানুষের মন-হৃদয়-অন্তরে। ■

---

*প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক*

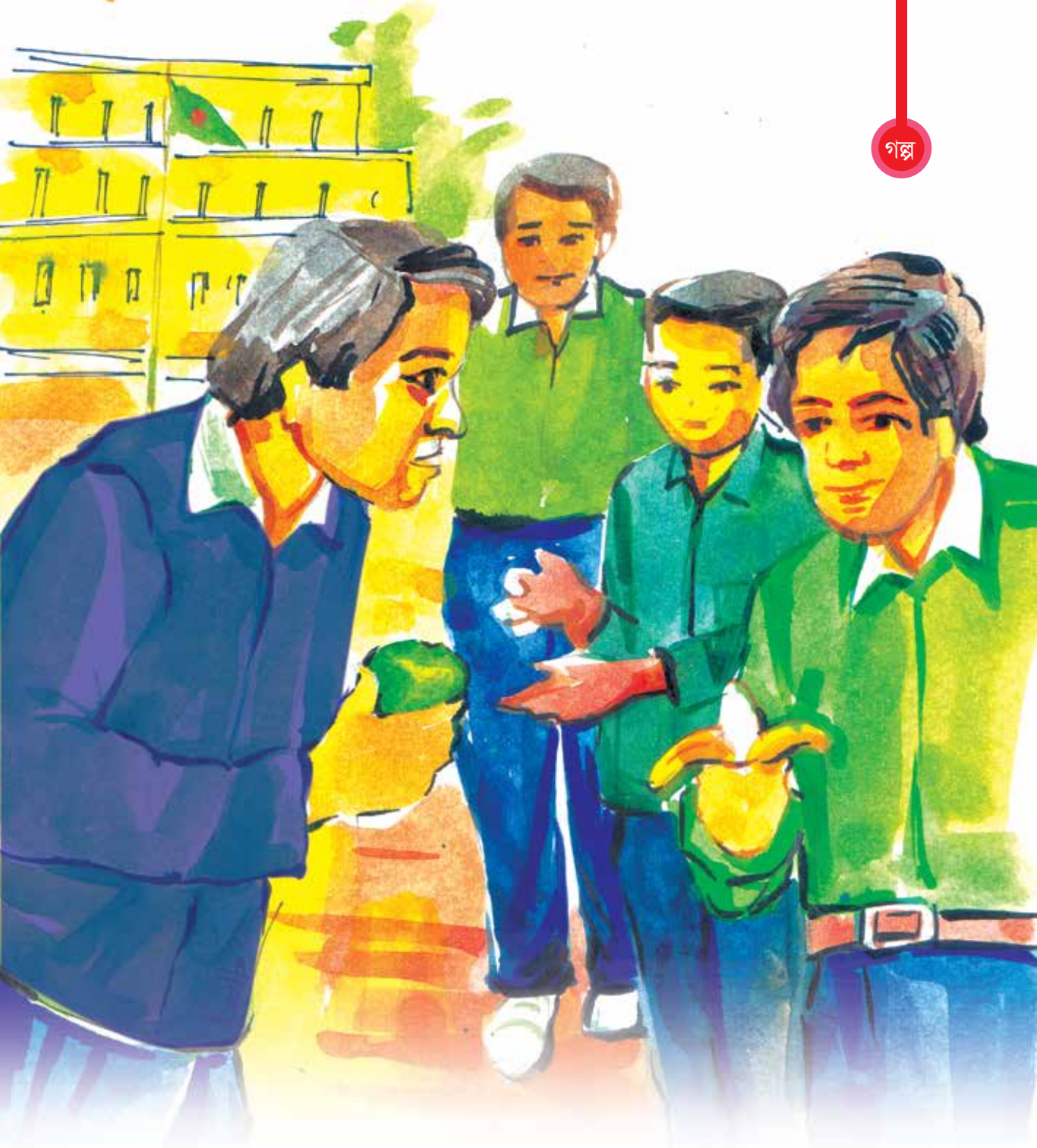

# ডাকতি

মনি হায়দার

টিটনকে একটা মাইর দেওয়া দরকার, বড়ো একটা সাগর কলা মুখে দিয়ে চাবাতে চাবাতে বলে খসরু। ব্যাটা আমাকে ভয় দেখায়!

আমাকেও দেখিয়েছে, খসরুর কথা শেষ না হতেই

বলে আলো। আলোর হাতে একটা ডাসা পেয়ারা। পেয়ারায় কামড় দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলে, ওর একটা পা ভেঙে দেওয়া দরকার।

হি হি হি হাসে অমল কুমার।

বাঁকা চোখে তাকায় আলো, তুই হাসিস কেন?

তুই টিটনের একটা  পা ভেঙে দিলে কেমন করে হাঁটবে, ভেবে হাসি পাচ্ছে আমার। অমল কুমার আরও হাসে আর হাতের আপেলে কামড় দেয়।

কিন্তু টিটনের সঙ্গে পারব আমরা? কেমন দ্বিধা জানায় খসরু। খসরু নিজেই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা আর স্বাস্থ্যবান। ওর মধ্যে বুনো স্বভাব আছে। কথায় কথায় রেগে যায়। রেগে গেলে কখন যে কাকে মেরে বসবে, ঠিক নাই। এই বুনো স্বভাবের কারণেই টিটনের সঙ্গে ঝামেলাটা বাঁধে।

টিটন বরাবরই নিরীহ টাইপের। সাত চড়ে রা করে না। ছিপছিপে লম্বা গড়নের টিটন সব সময়ে দাঁতে দুই হাতের আঙুলের নখ খোটে। স্কুলের গণিত শিক্ষক মেহের আলী নখ কাটা থেকে ফিরানোর জন্য দুই হাতে দুই কান ধরে দোতলা বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে রাখে কয়েকবার। যতক্ষণ কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকে দুই হাতে ততক্ষণ আর নখ কাটে না টিটন। কী করে? দুই হাত তো কান ধরায় ব্যস্ত। যদিও চারজন- টিটন, আলো, অমল কুমার আর  খসরু একসঙ্গেই আড্ডা দেয়, একই ক্লাসে উজানগাও হাই স্কুলে পড়ে। কিন্তু মাঝেমধ্যে টিটন আর খসরুর মধ্যে মারামারি লেগে যায়।

মারামারি লাগলে টিটনই মার বেশি খায়। মার খেয়েও দমে না, তেড়ে যায়। ওর মধ্যে অদম্য ইচ্ছে আছে। পরাজিত হতে চায় না। মারামারির সময়ে আলো, আর অমল কুমার দাঁড়িয়ে থাকে। ধরতে বা থামাতে গেলে ওরা উলটো মার খায়। কী আর করা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিটন আর আলো মারামারি দেখে। খুব চায় খসরুকে আঘাত করতে কিন্তু টিটন দেখে যখনই আঘাত করতে যায় তখনই, খসরু এক বা দেড় ইঞ্চি লম্বা হাত বাড়িয়ে ধরায় কাছে ভিড়তে পারে না। আর খসরু লম্বা হাতে ঘুষি মারলে, নাকে-মুখে-গালে-মাথায় লাগে।

বুঝতে পারে, খসরুর লম্বা হাতের কারণে মার খেতে হবে আমাকে! মনটা খারাপ হয়ে যায় টিটনের। বাড়ি থেকে বের হয়ে হাঁটতে থাকে। মনটা খারাপ। কী, করলে হাতটা লম্বা করা যায়? সকালে, খুব সকালে উঠে ব্যায়াম করা শুরু করে। ব্যায়াম শেখার একটা বই কিনেছে টিটন। বইয়ে হাত লম্বা করার ব্যায়াম ছবিতে দেখানো আছে, দাঁড়িয়ে সামনের দিকে দু হাত প্রসারিত করে কাঁধ থেকে সামনে নিতে হবে, বারবার। এভাবে কয়েক দিন করলে হাত লম্বা হবে।

সেই চেষ্টাই করছে টিটন। কিন্তু দেড় মাস পার হয়ে যায় তবু হাত আর লম্বা হচ্ছে না। গত পরশু স্কুল থেকে আসার পথে মারামারি বাঁধে খসরুর সঙ্গে। আলো আর অমল কুমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চকলেট খাচ্ছে আর ওদের মারামারি দেখতে থাকে। স্কুল থেকে আসা বন্ধুরা দেখে আর হাসে...। মারামারিতে খসরুর একটা ঘুষি এসে লাগে টিটনের নাকে।

ও মা! বলে বসে পড়ে টিটন।

সঙ্গে সঙ্গে খসরু ওকে ধরে, কী রে টিটন, ব্যথা পেয়েছিস?

সর, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় টিটন। ব্যথায় কোঁকায় ও।

আলো আর অমল কুমার এসে হাত ধরে টেনে তোলে টিটনকে। স্কুলের বন্ধুরা দাঁড়িয়ে মিটমিট হাসে। যেতে যেতে লুবনা বলে শিবানীকে, বুঝেছিস এই চারজনের একটা বোটা। আর টিটন মার খায় খসরুর হাতে কিন্তু বোটা ছাড়ে না।

তো টিটন যায় কেন ওদের কাছে? ও মার খায়, অমল কুমার আর আলো তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর হাসে।

সমস্যা আছেরে...

কী সমস্যা?

টিটন আর খসরুর মারামারি থামাতে গেলে উলটো ওরা মার খায়।

তাই নাকি? অবাক শিবানী, তাহলে দুইজনে জনমভর মারামারি করুক বলে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলে যায় লুবনা আর শিবানী।

লুবনা আর শিবানী চলে যায় কিন্ত ওদের হাসি আর আলাপ কানে লাগে টিটনের, উজানগাওয়ের সবাই জানে আমি আর খসরু মারামারি করি। আর প্রতি বার

আমি হেরে যাই খসরুর কাছে। শুধু মাত্র ওর দেড় ইঞ্চি লম্বা হাতের কারণে। নিজের দুই হাতের দিকে তাকায়, হাত দুটোকে শত্রু মনে হয় টিটনের। কী করব আমি শত্রু হাত দুটো নিয়ে? কেটে ফেলব? কেটে ফেলে দিলে ভাত খাওয়া, লেখাপড়া করব কী দিয়ে? বিতৃষ্ণায় মনটা খিচড়ে যায়, পায়ের কাছে একটা ছোটো গোল পাতলা চাকতির মতো দেখে, ডান পায়ে লাথি মারে!

উহ্, খুব ব্যথা পেলাম গো!

কে? চমকে ওঠে টিটন। কে বলল? তাকায় চারদিকে, আবার লাথি মারে চাকতিটাকে টিটন, সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায়, আমাকে মারছ কেন? আমি ব্যথা পাই না?

টিটন বুঝতে পারে, চাকতিটা কথা বলছে। দ্রুত চাকতিটাকে হাতে তুলে নেয়, তাকিয়ে দেখে খুব সাধারণ একটা চাকতি, পিতলের তৈরি। চাকতির মাঝখানে একটা শূন্য। দেখতে ভালোই লাগে। কিন্তু চাকতি কথা বলতে পারে? অবাক কাণ্ড! চাকতির শরীরে ময়লা। ফু দিয়ে ময়লা সরিয়ে কোচরে রাখে চাকতিটাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, শরীরে একটা তীব্র ঝাঁকুনি খায়। কে ঝাঁকুনি দিলো?

শরীরের মধ্যে ঝিমঝিম একটা রক্তপ্রবাহ বয়ে যায়। আর নিজেকে ভীষণ বলশালী মনে হলো। কচা নদীর দিকে যেতে যেতে সামনে রাস্তার উপর হেমায়েতের পাগলা গরুটা দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছিল। ওকে দেখে ঘাস খাওয়া রেখে গরুটা তেড়ে আসে। আগে গরুটা তেড়ে আসলে টিটন দৌড়ে সরে যেত কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকল আর গরুটা শিং উঁচিয়ে এগিয়ে এলে, দুহাতে লম্বা শিং ধরে উলটো ঠেলে ধরে।

গরুটা কয়েক মুহূর্ত থমকে যায়। কী করে সম্ভব? গরুটা মনে মনে বলে, আমি শিং উঁচিয়ে এগিয়ে গেলেই টিটন তো দৌড়ে পালাতো। সেই টিটন আজ... ক্রোধে গরুটা পিছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে টিটনকে শিং উঁচিয়ে ধাক্কা মারে। কিন্তু টিটনকে এক চুলও নড়াতে পারে না, বরং টিটন ঠেলে ঠেলে গরুট-াকে পিছনে নিয়ে যায়। কয়েক কদম পিছনে যেতে বাধ্য হয় হেমায়েতের পাতলা গরুটা। যেতে যেতে রাস্তার কিনারে পৌঁছে গেলে গরুটা রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজেকে হ্যাচকা টানে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছনে ফিরে ভোঁ- দৌড়!

নিজেই অবাক টিটন, কী করে সম্ভব? চাকতিটাই কী...। মনের মধ্যে উদ্দাম আনন্দ ওকে পেয়ে বসে। দৌড়ে কচা নদীর পাড়ে যায়। নদীর ঘোলা পানিতে মুখ ধুয়ে দাঁড়ায়। নদীর মাঝ দিয়ে বয়ে যায় স্রোতের ধারা, সঙ্গে কচুরিপানা। কয়েকটা ডিঙ্গি নৌকাও আছে। ও ঘুরে দাঁড়ায়। দেখতে পায় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে তিনজন– খসরু, আলো আর অমল কুমার। বুঝতে পারে, ওকে খুঁজতে এসেছে। ওরা রাস্তা থেকে নেমে দৌড়ে টিটনের কাছে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ায়।

কীরে টিটন,আজ স্কুলে যাসনি কেন?

অমল কুমার হাসে, যায়নি তোর হাতের মার আর কত খাবে বেচারা!

সঙ্গে সঙ্গে ঘুষি মারে টিটন। ঘুষি খেয়ে মাটিতে পড়ে যায় অমল কুমার। এগিয়ে আসে টিটনের দিকে আলো, দাঁড়ায় মুখোমুখি, তুই ওকে মারলি কেন?
আরও মারব।
পারলে মার।

সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা দেয় আলোকে। আলো তুলোর মতো উড়ে গিয়ে পড়ে মাটির উপর। পরেই চিৎকার করে, ওরে রে... পিঠে ব্যথা পেয়েছি রে...।

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল খসরু। আলো আর অমল কুমারকে পড়ে যেতে দেখে পাগলা গরুটার গতিতে ছুটে যায় টিটনের দিকে। কিন্তু টিটন সরে না, কেবল কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে খসরুর দিকে। এগিয়ে যায় হাত বাগিয়ে টিটনের দিকে তীব্র আক্রোশে। কিন্তু দুজনের মতোই একটা ধাক্কায় খসরু পাকা বেলের গতিতে মাটিতে আছড়ে পরে। তিনজনই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে টিটনের দিকে। টিটন ওদের মাটিতে ফেলে রেখে রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করে।

ওরা দাঁড়িয়ে শরীরের ময়লা ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তাকায় টিটনের দিকে। টিটন ফিরেও তাকায় না। দৃঢ় পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে রাস্তায় ওঠে। রাস্তা পার হয়ে চলে যায় খসরু, আলো আর অমল কুমারের চোখের আড়ালে। কিন্তু ওরা কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। কী এমন ঘটনা ঘটল যে, এক রাতের পর একটা টিটন তিনজনকে...।

কী করা যায় বল তো? খসরু প্রশ্ন করে দুজনকে। কী করে টিটন এমন শক্তির অধিকারী হলো?

ও তো ব্যায়াম করে- উত্তর দেয় অমল কুমার। ব্যায়াম করলে এমন শক্তি হয় শরীরে।

ব্যায়াম করলে এক রাতের মধ্যে... না, সম্ভব না। মাথা নাড়ায় আলো। নিশ্চয়ই টিটন এমন কোনো কিছু পেয়েছে, যা পেয়ে ওর শরীরে শক্তি ভর করেছে।

হতে পারে, সমর্থন করে খসরু। চল আমরা তিনজনে একসঙ্গে আক্রমণ করে দেখি, কী আছে টিটনের কাছে। কিন্তু আমরা পারব? সংশয়ের সঙ্গে বলে আলো।

একবার মার খেয়ে ভয় পেয়ে গেলি আলো? তিরস্কার করে খসরু। টিটন যত শক্তিশালীই হোক না কেন, আমরা তিনজন। তিন দিক দিয়ে আক্রমণ করলে ও

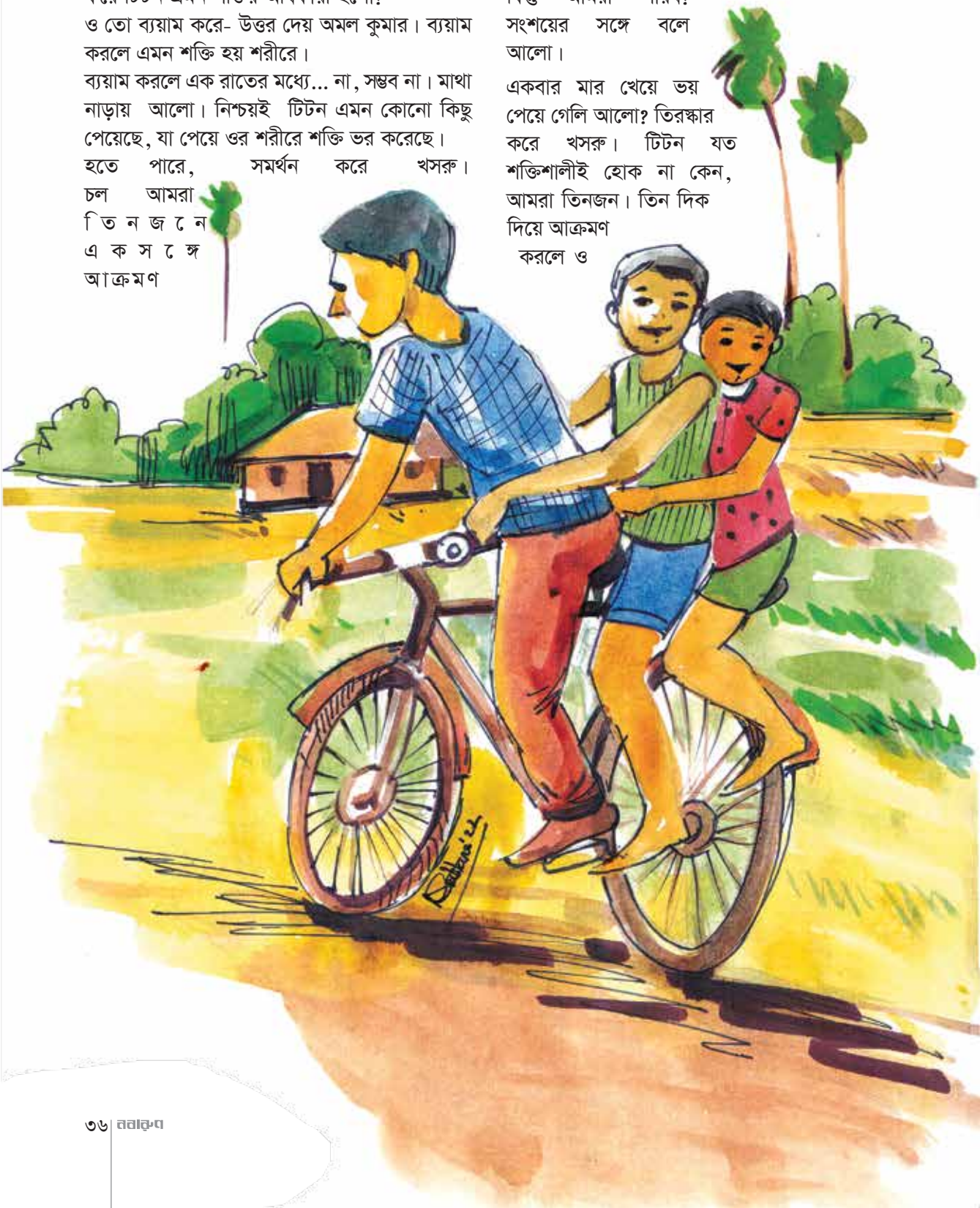

কিচ্ছু করতে পারবে না।

চল, ধরি ওকে।

খসরু, আলো আর অমল কুমার তিনজনে দৌড়ে রাস্তায় আসে। তাকায় এদিকে ওদিকে। কিন্তু কোথাও নেই টিটন। অবাক ওরা, কোথায় গেল? রাস্তার পর বিরাট কোলা। কোলা পার হয়ে গ্রাম। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কোথায় গেল টিটন?

খসরু, আলো আর অমল কুমার অনেক চিন্তা করেও কোনো কূলকিনারা করতে পারে না। চিন্তিত ওরা, বুঝতে পেরেছে এখন থেকে উলটো টিটনের কাছে মার খেতে হবে। কিন্ত সেটা কী করে সম্ভব? স্কুলের স্যারের কাছে টিটনের বিরুদ্ধে নালিশ করবে? কিন্তু স্যারেরা বিশ্বাস করবে যে একা টিটন তিনজনকে মারে? স্কুলের বন্ধুরা, উজানগাও গ্রামের সবাই জানে, টিটন মার খায় খসরুর হাতে।

মুশকিল রে...

অমল কুমার বলে, খসরু আমার এক মামা আছে। মামাকে সব ঘটনা বললে, অমাবস্যার রাতে বাড়ির সামনের পাকুড়গাছের নিচে একটা আয়না নিয়ে বসে সে। সেই আয়নায় সব দেখে, সকালে বলে দেয়।

তাই নাকি? উৎসাহের সঙ্গে তাকায় খসরু।

মাথা নাড়ে অমল কুমার, হ্যাঁ সত্যি। গত বছর আমি দেখেছি তো নিজের চোখে।

চল, আগামীকালই তোর মামা বাড়ি যাই!

কিন্তু অমাবশ্যার তো বেশ কয়েকদিন দেরি। আর টাকা দিতে হবে, এক হাজার একশত এক টাকা।

এক হাজার এক শত এক টাকা! আতঁকে ওঠে দুই জন।

মাথা নাড়ায় অমল কুমার, হ্যাঁ।

দুপুর। খিদে পেয়েছে। তিনজনে বাড়ি চলে যায়। রাতে পড়ায় মন বসে না– কেবলই চিন্তা, এখন থেকে টিটনের হাতে মার খেতে হবে? কী করা যায়? কী করা যায়- তিনজনে নানা ভাবনা ভাবে, কিন্ত কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পারে না। কোনোরকম খেয়ে ঘুমিয়ে যায় যার যার বাড়িতে।

সকালে ঘুম ভাঙে তিনজনের। ওরা স্কুলের জামা-প্যান্ট পরে, হাতে বই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে টিটনদের বাড়ির সামনে। টিটনও বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। চারজনে- টিটন, খসরু, অমল কুমার আর আলো একসঙ্গে হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে স্কুলে যায়। উজানগাওয়ের লোকেরা, স্কুলের বন্ধুরা অবাক– ওদের মধ্যে কোনো মারামারি নেই। চারজনে মিলেমিশে স্কুলে যাচ্ছে, ঘটনা কী?

রাতে ঘুমানোর আগে চাকতিটা বালিশের নিচে রেখে ঘুমিয়েছিল টিটন। ঘুমিয়ে যাবার পর টিটনের বালি-শের নিচ থেকে চাকতিটা বের হয়ে তিন বন্ধুর বাড়ি যায়। একেকজনকে ঘুম থেকে তুলে চাকতিটা বলে, তোমরা চারজনে বন্ধু না? একসঙ্গে তোমরা খেলতে যাও, বেড়াতে যাও, টিচারের কাছে পড়ো। সবাই তোমাদের ভয় পেত। এখন যে মারামারি করে একে অপরের বিরুদ্ধে যাচ্ছ, তোমাদের বন্ধুত্ব দুর্বল হয়ে যাচ্ছে না! উজানগাওয়ের মানুষেরা হাসাহাসি করছে না? শোনো, বন্ধুত্ব অনেক মায়ার আর সুন্দরের...। বন্ধুত্ব নষ্ট করো না।

সরি, খুব ভুল হয়েছে। আমাদের কেউ এমন করে বলেনি কখনো

চাকতিটা হাসে মিটিমিটি, কাল সকালে চারজনে মিলে স্কুলে যাবে। তাহলেই সবাই দেখতে আর বুঝতে পারবে, তোমাদের বন্ধুত্ব অটুট।

তোমার পরামর্শ মেনে নিলাম কিন্তু তুমি কে?

আমি বন্ধুত্ব!

তাই? তুমি থাকো কোথায়?

পথে পথে, যাদের বন্ধুত্ব ভেঙে যায়, আমি সেই বন্ধুত্ব গড়ে দিই...।

টিটন সকালে উঠে বালিশের নিচে চাকতি খুঁজে পায় না। মন একটু খারাপ হলেও বন্ধুদের ফিরে পাওয়ায় বেজায় খুশি। চারজনে স্কুলে যায়, খসরুর সাইকেলে চড়ে। খসরু সাইকেল চালায়। একজন সামনের রডের উপর বসা। দুজন পিছনে চাপাচাপি করে বসেছে। গ্রামের রাস্তার উপর দিয়ে সাইকেল চলছে হাওয়ার বেগে...। বাতাসে তাদের চুল উড়ছে। ■

---

*শিশু সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক*

# ছবিতে রাসেল

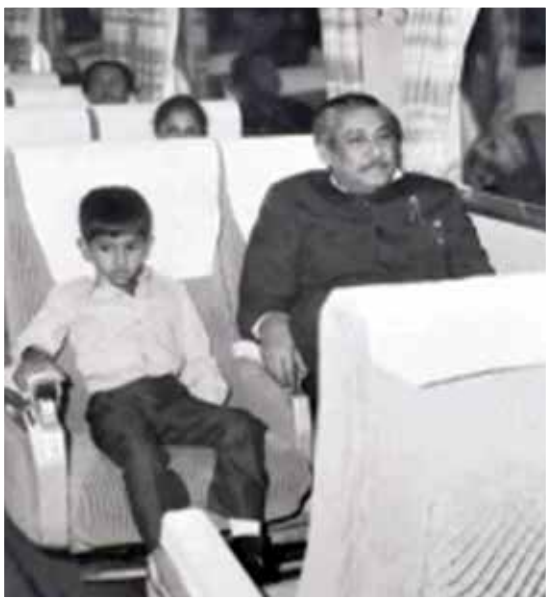

# গড়বে শিশু সোনার দেশ

মারজুক আবদুল্লাহ

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই আগামী দিনে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে তুলবে কল্যাণকর বিশ্ব। শিশুর উন্নত ভবিষ্যৎ মানে একটি উন্নত পৃথিবী। সেই স্বপ্ন আমরা সবাই লালন করি এবং বলে থাকি আগামীর পৃথিবী হবে শিশুদের। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালন করে। এবারের শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য–'গড়বে শিশু সোনার দেশ ছড়িয়ে দিয়ে আলোর রেশ'। একই সাথে ৩ থেকে ৯ই অক্টোবর শিশুর বিকাশ ও উন্নয়নে সকলকে অধিক মনোযোগী হওয়ার জন্য শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। শিশুদের জন্য সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশে শিশুদের অধিকার সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত করেছিলেন।

বৈশ্বিক মহামারি আমাদের শিশুদের একটি বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। মহামারি রোধে অন্য সবার মতো শিশুরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ঘরবন্দি হয়ে পড়ে; পরবর্তীতে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুললেও শিশুদের স্বাভাবিক জীবনে খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে। কোমলমতি শিশুদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে শিশুদের ওপর জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দিলে। এক্ষেত্রে, শিক্ষক অভিভাবক সবাইকে শিশুর প্রতি সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন। করোনা মহামারিতে অনেক শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। শিশুদের ঝরে পড়ার সঠিক কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে। প্রত্যেকটি শিশু সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে শিশুরা একটি উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

শিশুদেরকে কখনোই চাপে ফেলা যাবে না, ভালো কিছু করার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিশুকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তাকে সাহস দিতে হবে। পরিবারই শিশুর সবচেয়ে বড়ো শক্তি। ইদানীং কালের ব্যস্ত সময়ে পারিবারিক বন্ধনের অভাব হয়ে উঠছে। অভিভাবকদের এ বিষয়ে আরো মনোযোগী হতে হবে। শিশুরা যাতে তাদের মনের ইচ্ছা বা সমস্যাগুলো বাবা-মা'র সাথে শেয়ার করতে আগ্রহী হয় সেভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শৈশব থেকেই শিশুর সাথে বাবা মায়ের ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কথা বলা এবং নিজেদের কণ্ঠকে জোরদার করা। শিশুদের প্রয়োজনে সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিশুদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে নিরাপদ ও সুষ্ঠু পরিবেশ, মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা এবং নির্যাতন ও নিপীড়নমুক্ত সমাজ।

নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দেশের প্রতিটি নাগরিককে শিশু অধিকার রক্ষায় কাজ করে যেতে হবে। সকলের প্রচেষ্টায় শিশু অধিকার সুরক্ষিত হবে। শিশু অধিকার সনদ ও মৌলিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের সম্পদ। প্রতিটি শিশুর পূর্ণ অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা দেওয়া রাষ্ট্রের তথা সকলের দায়িত্ব। সকলে মিলে আমরা শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নে সহযোগিতা করব তবেই আমাদের শিশুরা সারা পৃথিবীতে আলোর রেশ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে।■

*শিক্ষার্থী*

# ছোটো থেকেই শিখতে হবে

রকিবুল ইসলাম

টিপুর ছোটো কাকু শহরে থাকেন। সময় সুযোগ পেলে টিপু তাই শহরে যাওয়ার চেষ্টা করে। তো সেইবার গেল ওর দাদুর সঙ্গে। দাদু আর টিপু। আর কেউ নয়।

ছোটো কাকুর বাসায় প্রথম দিন ঘরেই বন্দি থাকতে হলো। আসলে শহরের বাড়িগুলো এমন গিজিগিজি দাঁড়িয়ে থাকে যে, একটা থেকে আরেকটা ছোঁয়া যায়। টিপুর তাই দম বন্ধ হয়ে আসে। তবে মাঝেমধ্যে শহরে আসতে ওর ভালোই লাগে।

পরদিন দাদুর সঙ্গে বের হলো টিপু। ওরা যাবে শিশুপার্কে। দাদু টিপু আর মিলু। মিলু হচ্ছে ছোটো কাকুর বড়ো ছেলে। টিপু আর মিলু দাদুর সঙ্গে গল্প করছে আর হাঁটছে। কিছুদূর পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। মেইন রাস্তায় উঠে তবেই গাড়ি। সেখান থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় যেতে হবে শাহবাগ। খিলগাঁও থেকে শাহবাগ বেশি দূরে নয়। কিন্তু ঢাকায় গাড়ি ও মানুষের যে জ্যাম! তাই সময় একটু বেশিই লাগে।

দাদু হাঁটছিলেন আগে আগে। একটু পেছনে বামপাশে টিপু আর মিলু। হঠাৎ একটি বল এসে দাদুর পায়ে লাগল। দাদু দাঁড়িয়ে গেলেন। সাথে সাথে আমরাও দাঁড়ালাম।

দাদু বলটা তুলে হাতে নিলেন। একটি ছেলে দৌড়ে এলো। বলল, বলটা দিন না দাদু!

দাদু বললেন, কে মেরেছে বল?

ছেলেটা ইশারায় অন্য একটি ছেলেকে দেখিয়ে দিল।

রাস্তার গলিতে সাত আটজন ছেলে ক্রিকেট খেলছিল। সেখান থেকেই এসেছে বলটা। ভাগ্যিস, দাদুর পায়ে লাগেনি তেমন।

দাদু বললেন, ঐ ছেলেকে ডাকো। তারপর বল দেবো।

ঐ ছেলেকে ডাকতেই এগিয়ে এলো সবাই। শহরের ছেলেদের সাহস বেশি। গ্রামে হলে ভয়ে তো সবাই দিত দৌড়!

ছেলেগুলো এসে আমাদের চারপাশে দাঁড়াল।

দাদু বললেন, তোমাদের দলনেতা কে?

দলনেতা মানে ক্যাপটেন। মিলু টিপুর চেয়ে ছোটো। তাই বুঝতে না পারায় টিপু ওকে অর্থ বলে দিলো।

একটি ছেলে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, আমি ক্যাপটেন। কী হয়েছে বলুন।

দাদু বললেন, শোনো আমি তোমাদের কিছুই বলব না। কিংবা কিছু করতেও বলব না।

ছেলেটা বলল, তাহলে আমাদের বলটা দিয়ে দিন দাদু।

দাদু বললেন, তোমাদের বল তো অবশ্যই পাবে। তার আগে আমি কিছু কথা বলব তোমাদের।

দাদুর কথা শুনে এবার মাথা নিচু করল সবাই।

দাদু আবার বললেন, তোমরা কি নিয়মিতই এভাবে রাস্তায় খেলো?

ক্যাপটেন বলল, হ্যাঁ প্রায়ই খেলি।

দাদু বললেন, এভাবে রাস্তায় খেলো কেন? অন্য কোথাও খেলতে পারো না? তাছাড়া রাস্তায় খেললে কী হয় জানো তোমরা?

সবাই মাথা নিচু করে থাকল। কেউ কোনো কথা বলল না।

দাদুই কথা বললেন, শোনো, আমি জানি তোমরা এর জবাব দিতে পারবে না। তোমরা সবাই ছোটো। তোমাদের মাথায় এসব আসবে না। মানুষের চলাচলের রাস্তায় এভাবে খেললে অনেক সমস্যা হতে পারে। বল মারলে সেটা কারোও মাথায় কিংবা চোখে-মুখে লাগতে পারে। কী, ঠিক বলছি?

ওদের মধ্য থেকে একজন বলল, তা ঠিক বলেছেন দাদু।

দাদু একটু থেমে আবারও বলতে লাগলেন। শোনো, বলটা যদি আমার পায়ে না লেগে মাথায় কিংবা চোখে মুখে কোথাও লাগত! এতক্ষণ আমার কী অবস্থা হতো ভাবতে পারছ? পথচারীদের মধ্যে অনেক বয়স্ক মানুষ থাকেন, ছোটো ছেলেমেয়ে থাকে, কোলের বাচ্চাও থাকে, তাদের যদি চোখে-মুখে কোথাও লাগে, তাহলে!

সবাই দাদুর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। মিলু আর আমিও মনোযোগী শ্রোতা হয়ে শুনছি দাদুর কথা।

ক্যাপটেন দাদুর হাত ধরে বলল, দাদু আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আমরা বুঝতে পারিনি।

দাদু বললেন, এই তো তোমরা তোমাদের ভুল বুঝতে পেরেছ। এবার বলো, তোমাদের ইশকুল কোথায়? ইশকুলের মাঠেই তো খেলতে পারো!

ক্যাপটেন বলল, ইশকুলের মাঠে তালা লাগানো থাকে। সেখানে বিকেলে যাওয়া যায় না।

দাদু বললেন, খুব খারাপ কথা। ইশকুলের মাঠ থাকবে খোলা। সেখানে মহল্লার ছেলেরা খেলবে। প্রয়োজনে সন্ধ্যার সময় দারোয়ান গেইট লাগিয়ে দেবে। আমি ইশকুলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলব। প্রয়োজনে কমিটির সঙ্গেও কথা বলব। তোমরা এরপর থেকে ইশকুলের মাঠেই খেলতে পারবে।

ছেলেগুলো আনন্দে লাফিয়ে উঠল। খুশিতে দাদুকে জড়িয়ে ধরল।

দাদু বললেন, আজ তোমরা বাসায় চলে যাও। আগামীকাল সকালে এখানে আসবে। তোমাদের সঙ্গে নিয়ে ইশকুলে যাব।

সবাই চলে গেল। এদিকে আমাদের যাওয়ার সময়ও শেষ। সন্ধ্যা নামি নামি করছে। আজ আর শিশুপার্কে যাওয়া হলো না। যাওয়া না হলেও অনেক কিছু জানা তো হলো!

দাদু বললেন, আজ চলো বাসায় ফিরে যাই। আগামীকাল বিকেলে যাওয়া যাবে শিশুপার্কে। আর হ্যাঁ, আজ তোমরা যা শিখলে তা কিন্তু এখন থেকেই মনে রাখবে। আর কী মনে রাখবে?

টিপুও সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, ছোটো থেকেই শিখতে হবে।

বন্ধুরা, নিশ্চয়ই তোমরা গল্পটির মূল কথা বুঝতে পেরেছ। টিপু তাহলে কী শিখল? রাস্তায় খেলাধুলা করা যাবে না। খেলার জন্য মাঠে যেতে হবে। মাঠ না থাকলে বাড়ির আঙিনায় খুব নিরাপত্তা বজায় রেখে খেলতে হবে। তাহলে তোমরাও এটা শিখে রাখো। রাস্তায় খেলাধুলা করা কিংবা আড্ডা দেয়া যাবে না। এতে পথচারিদের অসুবিধা হয় আর অন্যের অসুবিধা হয় এমন কাজ কখনোই করা যাবে না। ■

---

*শিশু সাহিত্যিক*

# রেকর্ড করা শিশুরা

শিশুরা চির সুন্দর। শিশুদের সকল অভিব্যক্তিই আমাদের মন ছুঁয়ে যায়, এরই মাঝে কিছু হয় বিশ্ব রেকর্ড। আজ তোমাদের জানাবো তেমনি কিছু শিশুর কথা।

## জন্মের পরই হাসি

ডাক্তারি বিদ্যা বলে পুরোপুরি হাসতে শিশুর সময় লাগে ৬ থেকে ১২ সপ্তাহ। কিন্তু শুনলে অবাক হয়ে যাবে, জন্মের মাত্র ৫ সেকেণ্ড পরেই হাসতে দেখা গিয়েছে এই শিশুকে। রীতিমতো খিলখিলিয়ে হাসি। তার হাসি শুধু সবাইকে অবাকই করেনি, গড়ে ফেলেছে বিশ্ব রেকর্ড।

## স্মৃতিশক্তির রেকর্ড

মাত্র আড়াই বছরে রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি বিশ্ববাসীর

কাছে এখন বিস্ময় বালক হিসেবে পরিচিত মায়ান। ছবি দেখালেই গড়গড় করে বলে দিচ্ছে দেশের সমস্ত নেতার নাম, রাজ্য ও রাজধানী, তামিল মাসের নাম, ইংরেজি মাসের নাম, ২৪৭টি তামিল অক্ষর, নম্বর এমনকি গাড়ির নামও। কোনো ঘটনা নিয়ে বেশ কয়েকদিন পরে প্রশ্ন করলেও, সেটা মনে রাখতে পারে সে। চেন্নাই তিরুঅনন্তপূরমের শিবগঙ্গায় থাকেন মায়ান।

## নি স্ট্রাইক (knee strike) মেরে ইতিহাস

হায়দ্রাবাদে তায়কোয়ান্দো খেলোয়ার আসমান। মাত্র পাঁচ বছর যার বয়স। সে এক ঘণ্টায় একেবারেই না থেমে ফুল কন্টাক্ট নি স্ট্রাইক (Full contact knee strike) মেরে রেকর্ড বানিয়েছে।

## জীবন্ত জ্ঞানভাণ্ডার

ভারতের উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা ময়ূখ বর্মন। যার বয়স মাত্র ৪ বছর। এই বয়সেই সে জেনারেল নলেজের দুরূহতম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে একাধিক ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নিজের স্থান দখল করে নিয়েছে। দেশ-বিদেশের নানান প্রশ্নের উত্তর মুহূর্তের মধ্যেই বলে দিতে পারছে এই চার বছরের শিশু। আর এই প্রতিভার জন্য ইতোমধ্যেই আমেরিকা বুক অব অ্যাওয়ার্ড, নাইজেরিয়া বুক অব অ্যাওয়ার্ড, ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে ছোট্ট শিশু ময়ূখের নাম খোদাই করা হয়েছে।

## ইয়োগা করে বিশ্ব রেকর্ড

রেয়ানশ সুরানি। ২০০ ঘণ্টা ইয়োগা করে নাম উঠিয়েছেন গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সেই রেকর্ডধারীর বয়স মাত্র ৯ বছর ২২০ দিন। তিনিই বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ইয়োগা ট্রেইনার। মাত্র ৪ বছর বয়স থেকেই সে প্রতিদিন যোগাসন করত। এভাবে ইয়োগা করতে করতেই তার ২০০ ঘণ্টা শেষ হয় মাত্র ৯ বছর বয়সে। ২০২১ সালের ইয়োগা স্কুল আনন্দ শেখর যোগাসন স্কুল থেকে সার্টিফিকেট পান। ২০২২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তার নাম ওঠে গিনেস বিশ্ব রেকর্ডসের খাতায়।

## ছোট্ট কম্পিউটার প্রোগ্রামার

আহমেদাবাদের ছেলে আরহাম ওম তালসানিয়া। কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম উঠল এই খুদের। বয়স মাত্র ৬, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ বিশাল জ্ঞান অর্জন করে তাক লাগিয়ে দিল এই খুদে। আরহাম মাত্র ৩ বছর বয়স থেকেই বাবার সাথে পাইথন প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করে।

## ১২ বছরে গ্রান্ড মাস্টার

দাবায় বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলল ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্ষুদে প্রতিভা অভিমন্যু মিশ্র (Abhimanyu Mishra)। মাত্র ১২ বছর ৪ মাস ২৫ দিন বয়সেই দাবার তিনটি আইএম নর্ম সম্পূর্ণ করে গ্র্যান্ড মাস্টারের খেতাব জিতে নিয়েছে অভিমন্যু।

## হাতে দু-দুটো বিশ্বরেকর্ড

মুখের বুলি স্পষ্ট হয়নি তবুও তার হাতে চলে এল দু-দুটো বিশ্বরেকর্ড। ইন্টারন্যাশনাল বুক অব রেকর্ডসে নাম তুলল বাঁকুড়ার ছোট্ট অভিলাশা আখুলী। যার বয়স মাত্র ৩ বছর ৮ মাস। বিবেকানন্দ মিশন স্কুলের এই ছাত্রী মাত্র ২৪ সেকেন্ডে ২৬টি ন্যাটো ফোনেটিক্স বর্ণমালার আলফা থেকে জুলু পর্যন্ত দ্রুততম উত্তর দিয়ে প্রথম বিশ্বরেকর্ডটি অর্জন করেছে। দ্বিতীয় রেকর্ডটি সে তৈরি করেছে মাত্র ৫ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে ইংরেজি ভাষায় ৬২টি প্রাণীর শাবকদের নাম, তাদের দ্বারা তৈরি শব্দ এবং তাদের বাসস্থানের নাম একনাগাড়ে মুখস্থ বলে।

## তালি বাজিয়ে রেকর্ড

নয় বছরের এক শিশু হাততালির জন্য নিজের নাম উঠিয়েছেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। এক মিনিটে এক হাজারেরও বেশি বার তালি বাজিয়ে রেকর্ড করেছে শিশুটি। শিশুটির নাম সেভেন ওয়েড, সে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার বাসিন্দা।

## প্রতিভার কাছে বয়সের হার

হাওড়া মন্দিরতলার বাসিন্দা দশ বছর বয়েসের ঋতমা ধর দেশের কনিষ্ঠতম হিসেবে 'ইন্ডিয়ান বুক অব রেকর্ডস-এ নাম তুলল। ঋতমা মাত্র তিন বছর বয়সে খেলার ছলে ছবি আঁকা শুরু করে। ঋতমার মা রুপা দেবীর দাবি ছোটো থেকেই মেয়ে চেষ্টা করেছিল ডাল, কুমড়ো বীজ ও চিড়ার উপর ছবি আঁকার। চেষ্টার এক পর্যায়ে কুমড়োর বীজে একে একে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ছবি আঁকতে শুরু করে। শুধু তাই নয় সে এই বীজে ফুটিয়ে তোলে আস্ত এক গ্রামের ছবি। সেই সৃষ্টিকলা দেখে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডস দফতরের বিচারকরা মুগ্ধ হয়ে দেন বিশেষ সম্মাননা।

## নয় প্রেস-আপ দিয়ে বিশ্বরেকর্ড

ছোট্ট শোয়ার্জেনেগার বলে পরিচিত এখন রাখিম কুরায়েভ। একের পর এক নয় বার প্রেস-আপ দিয়ে, একেবারে ছয়টা বিশ্বরেকর্ড নিজের দখলে নিয়েছে রাখিম। মাত্র আড়াই ঘণ্টায় ৩২০২টি প্রেস-আপ সম্পূর্ণ করে সে! এখন পর্যন্ত রাখিমকে টপকাতে পারেনি কেউই। ■

*প্রতিবেদন: শফিউল ইসলাম*

# বাংলাদেশের রেকর্ডধারীরা

## তাকরীমের বিশ্ব জয়

সালেহ আহমদ তাকরীম। বাংলাদেশের একজন কোরানের হাফেজ। ২০০৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার ভাদ্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে সে। বাবা হাফেজ আব্দুর রহমান পেশায় মাদ্রাসার শিক্ষক এবং মা গৃহিণী। তাকরীম মাত্র সাড়ে ৯ বছর বয়সে সম্পূর্ণ কোরান মুখস্ত করে। বর্তমানে মিরপুরের মারকাযু ফয়জিল কুরআন আল ইসলামী ঢাকা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ২০২২ সালে মার্চ মাসে ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠিত ৩৮তম ইরান আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরান প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে। লিবিয়ায় আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরান প্রতিযোগিতায় সপ্তম স্থান অর্জন করে তাকরীম। ২০২২ সালে সৌদি আরবের মক্কায় অনুষ্ঠিত ৪২তম বাদশাহ আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিশ্বের ১১১টি দেশের ১৫৩ জন হাফেজ এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার চতুর্থ শাখায় তাকরীম তৃতীয় স্থান অর্জন করে ১ লাখ রিয়াল অর্থমূল্যের পুরস্কার লাভ করে। তার এ অর্জনে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাকে সংবর্ধনা দেয়।

## আবারও গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডভুক্ত

আগেও গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নিজের নাম তুলেছেন অন্তু। সে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র। বাড়ি নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলায়। এক মিনিটে হাতের পিঠে ১০০ এবং ৩০ সেকেন্ডে ৬৫টি রেখে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়েছেন। এর আগেও অন্তু দ্রুত সময়ে ১০টি মাস্ক পড়ে, হাতের স্পর্শ ছাড়াই দ্রুত সময়ে কলা খেয়ে ও স্ট্যাপলারের পিন দিয়ে শিকল তৈরি করে গিনেস রেকর্ডভুক্ত হন। এর ফলে অন্তু মোট চারবার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নিজের নাম উঠালেন। করোনাকালে স্কুল বন্ধ থাকায় ২০২১ সালে দুটি গিনেস রেকর্ড গড়তে সক্ষম হন। প্রথমটা স্ট্যাপলারের পিন দিয়ে শিকল তৈরি করে এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ পিলের ৭.৩৫ সেকেন্ডের রেকর্ড ভেঙে মাত্র ৭.১৬ সেকেন্ডে ১০টি সার্জিক্যাল মাস্ক পরিধান করে। এবার বিশ্বের অনেক রেকর্ডগুলোর মধ্য থেকে এক মিনিট ও ৩০ সেকেন্ডে সর্বোচ্চ পেন্সিল হাতের ওপর রাখার রেকর্ডটি। রেকর্ড দুটি ভাঙার জন্য গিনেস বুকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের ১২ই ফেব্রুয়ারি আবেদনের পর ৫ই মার্চ গিনেস বুক আবেদন গ্রহণ করে অনুমতি দেয়। নির্দেশনা মতো আমার রেকর্ড দুটির ভিডিও দেখে গিনেস কর্তৃপক্ষ ই-মেইলের মাধ্যমে জানায়, রেকর্ড দুটির কথা। অন্তু এই ক্যাটাগরিতে বিশ্ব রেকর্ডধারী।

## গিনেস বুকে নাম উঠল আয়মান মোহাম্মদের

গিনেস ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন কিশোর আয়মান মোহাম্মদ। তার বাড়ি চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায়। সে এক মিনিটে সর্বোচ্চ ৭৫টি কয়েন দিয়ে টাওয়ার বানিয়ে 'মোস্ট কয়েন স্ট্যাকড ইন টু এ টাওয়ার' তৈরির রেকর্ডটি গড়েছে ১৬ বছরের এই কিশোর। আয়মান হাটহাজারী পৌরসভার পার্বতী মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের এসএসসি পরীক্ষার্থী। পড়াশুনার পাশাপাশি ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গিনেস বুকের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন রেকর্ড দেখে তার মনে ইচ্ছা জাগে রেকর্ড গড়ার। সেই প্রচেষ্টা থেকে এক মিনিটের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৫টি কয়েন দিয়ে টাওয়ার সাজিয়ে আজ সফল। রেকর্ডটি গিনেস বুকে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে আবেদন করার পর গিনেস বুক কর্তৃপক্ষ আবেদনটি গ্রহণ করে রেকর্ডটির ভিডিও পাঠানোর জন্য বলে। তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী রেকর্ডটি ভিডিও পাঠায়। তার রেকর্ডটি সফল হওয়ার ফলাফল জানায়। তিনিই এখন এই ক্যাটাগরিতে রেকর্ড হোল্ডার। ■

*প্রতিবেদন : সানজিদ হোসেন শুভ*

# অসাধারণ প্রতিভাধর শিশু

পৃথিবীতে এমন কিছু বিস্ময়শিশু রয়েছে যারা তাদের ভিন্নধর্মী কাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অবাক করেছে। বিজ্ঞান, খেলাধুলা, প্রযুক্তি কিংবা শারীরিক কসরতেও তাদের অভাবনীয় প্রতিভা মানুষকে ফেলেছে ধাঁধার মধ্যে। আজ জানাবো পৃথিবীর এমনই কিছু বিস্ময় শিশু সম্পর্কে।

## কাইরান কাজী

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজী মাত্র ১০ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্লাস শুরু করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। যে বয়সে নিয়মানুযায়ী তার স্কুলে পড়ার কথা, সেই বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলেছে সে। মাত্র ১০ বছর বয়সে স্কুলের ফোর্থ গ্রেড থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্লাস শুরু করে অসাধারণ মেধাবী এই বালক। পড়াশোনা করছেন ক্যালিফোর্নিয়ার লস পাসিটোস কলেজে। ইতোমধ্যেই ডেভিডসন ইনস্টিটিউট ইয়ং স্কলারের তালিকায়ও নাম উঠেছে কাইরানের। তার কথাবার্তা ও আচরণ দেখে দুবছর বয়সেই ডাক্তাররা বলে দিয়েছিলেন যে, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কাইরান। এ ধরনের শিশুদের বলা হয়ে থাকে 'প্রফাউন্ডলি গিফটেড চাইল্ড (অসাধারণ প্রতিভাশালী শিশু)। পরীক্ষা করে দেখা যায়, তার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কুশেন্ট) বা বুদ্ধ্যাঙ্কের স্কোর ৯৯.৯৯ শতাংশেরও বেশি।

## মোন ডেভিস

মাত্র ১৩ বছর বয়সে বেসবল তারকা মোন ডেভিস খেলার মাঠে নিজেকে বিশ্বের অন্যতম সেরা খুদে অ্যাথলেটদের একজন হিসেবে গড়ে তুলেছেন। 'রিমেম্বার হার নেম' শিরোনামে তাকে নিয়ে বিখ্যাত স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড তাদের ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ করেছিল। ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে নিজেকে দেখার পরই মোন ডেভিসের উৎসাহটা যেন আরো বেড়ে যায়। এরপর হয়েছিলেন লিটল লিগ ওয়ার্ল্ড সিরিজের সেরা আকর্ষণ। তার দল ফিলাডেলফিয়ার হয়ে খেলায় মুগ্ধ করেছেন দর্শকদের। স্পোর্টস তারকা হিসেবে মোন ডেভিস দিন দিন নিজেকে নিয়ে যাচ্ছে অনন্য উচ্চতায়।

## আরাত হোসেইনি

বয়স মাত্র সাড়ে তিন বছর। নাম আরাত হোসেইনি। ইরানের বাবোল শহরের বাসিন্দা। ইনস্টাগ্রামের ভিডিওতে আরাতের অদ্ভুত কীর্তি দেখলে স্বয়ং স্পাইডারম্যানও তাকে ফলো করতে বাধ্য হয়! সাড়ে তিন বছর বয়সে সে ১০ ফুট উচ্চতার দেয়াল বেয়ে উঠে পড়ে তরতর করে। এ ছাড়া জিমন্যাস্টিকসের নানা কৌশল মুভ করে অবলীলায়। আরাতের বাবা নিজেই তার বাসায় সন্তানকে জিমন্যাস্টিকসের ট্রেনিং দিতে শুরু করেন। সেসব ভিডিও আপলোড করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ৫০০-এর ওপর ভিডিও আছে এই শিশুর।

## নিকোলা বার

মাত্র বারো বছর বয়েসি নিকোলা বার। যে কিনা এই বয়সেই বুদ্ধির পরীক্ষায় ছাড়িয়ে গেছে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে। বাবা মায়ের সাথে ইংল্যান্ডের এসেক্সের হার্লোতে বাস করে এই বিস্ময় শিশু নিকোলা। মেনসার পরীক্ষায় তার স্কোর ১৬২! সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের গড় আইকিউ স্কোর যেখানে ১০০। কারো আইকিউ স্কোর যদি ১৪০-এর বেশি হয় তবে সে জিনিয়াস। মেনসার মুখপাত্র আনা ক্লার্কসন জানান, নিকোলা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাধর ১% মানুষের একজন। ■

*প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা*

# শিশুদের অস্কার জিতল সিসিমপুর

রাশেদুল হক

জনপ্রিয় শিশুতোষ অনুষ্ঠান সিসিমপুর। প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের শেখাকে ও জানাকে আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য করার লক্ষ্যে সিসিমপুর অনুষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৫ সালে। এই অনুষ্ঠানটি তোমরা সবাই দেখো নিশ্চয়ই। খুশির খবর হচ্ছে, শিশুদের অস্কারখ্যাত 'কিডস্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড'- জিতেছে বাংলাদেশের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সিসিমপুর। বিশ্বের সেরা সব শিশুতোষ টিভি সিরিজকে পেছনে ফেলে সিসিমপুর তার ১৩তম সিজনের জন্য 'বেস্ট মিক্সড মিডিয়া সিরিজ' ক্যাটাগরিতে সেরার এই পুরস্কার লাভ করেছে।

২০শে জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে এক জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে চৌদ্দতম 'কিডস্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। বিশ্বখ্যাত সব শিশুতোষ অনুষ্ঠান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। 'কিডস্ক্রিন আওয়ার্ড' বিশ্বজুড়ে শিশু ও পরিবারদের নিয়ে নির্মিত সেরা সিরিজ, অ্যানিমেটেড, ফিল্ম, লাইভ অ্যাকশন প্রোগ্রামসহ নানা ক্যাটাগরিতে সেরা সব অনুষ্ঠানকে পুরস্কৃত করে থাকে। টানা ১৮ বছর টেলিভিশন পর্দায় সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শিশুতোষ টিভি সিরিজ সিসিমপুর।

প্রাক-প্রাথমিক শিশু বিকাশ কার্যক্রমের আওতায় 'শিশুরা হয়ে উঠুক আরও সম্পন্ন, আরও সবল এবং আরও সদয়' এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সিসেমি স্ট্রিট-এর বাংলাদেশি সংস্করণ সিসিমপুর। প্রতি বছর ১৫ই এপ্রিল 'সিসিমপুর দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়। এ অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে খেলার ছলে শিশুকে বর্ণ চেনা, বর্ণ চিহ্নিত করা, শব্দ মেলানো, বাক্য তৈরি করা শেখানো হয়। পাশাপাশি বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণের বিষয়টিকে সবসময় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। আর তাই সিসিমপুরের সব চরিত্রকে তাদের চরিত্র অনুযায়ী প্রত্যেকের শুদ্ধ উচ্চারণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। একই সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা, ঐতিহ্য আর জীবনযাপনকেও তুলে ধরা হয়। বিটিভিসহ বিভিন্ন চ্যানেলে সিসিমপুর অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়। সম্মানজনক 'কিডস্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড' জয়লাভের খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সিসিমপুর পরিবার। ■

# ছোটোদের আঁকা

**মুস্তানিবা মাবরুকা প্রতীতি**, ৪র্থ শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

**সায়মা আঞ্জুম বিভা**, নবম শ্রেণি, আইডিয়াল প্রিপারেটরী অ্যান্ড হাই স্কুল, শেরপুর

# জাতির পিতা

শহীদুল্লাহ শোভন

শেখ মুজিবের সোনার বাংলা
মোদের জন্মভূমি।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
হৃদয় প্রাণে তুমি।

টুঙ্গিপাড়ার ছোট্ট মুজিব
নাই ভেদাভেদ মনে।
করো কত খেলাধুলা
ছোটো-বড়ো সনে।
গরিব-দুখি জনে তোমার
বুকখানা যায় গলে।
মা-বাবা যে আদর করে
ডাকত খোকা বলে।

শেখ মুজিবের সোনার বাংলা
মোদের জন্মভূমি।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
হৃদয় প্রাণে তুমি।

বাবার আশিস মায়ের সোহাগ
বুকে লালন করে।
সবার তরে বাঁধ যে মন
চিত্ত মেলে ধরে।
ছুটছে ভারত ছন্নছাড়া
দাঙ্গা, আকাল, ভাগে।
জীবন মায়া ভুলে তুমি
সঁপ সেবায় আগে।

শেখ মুজিবের সোনার বাংলা
মোদের জন্মভূমি।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
হৃদয় প্রাণে তুমি।

পাকি'র ফাঁকির-জঞ্জালে যে
সত্য দিশেহারা।
কেঁপে ওঠে বাংলা মাতা
নাহি শান্তিধারা।
সত্য ন্যায়ের কণ্ঠ তুমি
দাও যে আলোর দিশা।
দূর করে সব অনিষ্টকে
ঘুচবে অমানিশা।

শেখ মুজিবের সোনার বাংলা
মোদের জন্মভূমি।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
হৃদয় প্রাণে তুমি।

৭ই মার্চে গর্জে ওঠে
তোমার বজ্রবাণী।
পাকি'রা তাই ডুবুডুবু
কাঁপে পাঁজরখানি।
বীর বাঙালি যুদ্ধ করে
জীবন মরণ পণে।
তোমার নীতি তোমার বুলি
যায় না ভুলে ক্ষণে।

শেখ মুজিবের সোনার বাংলা
মোদের জন্মভূমি।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
হৃদয় প্রাণে তুমি।

মুক্ত আকাশ মুক্ত বাতাস
মুক্ত পাখির ডানা।
মুক্ত আজি তোমার লাগি
মাতৃভূমি খানা।
সোনার বাংলা সুর তুলি আজ
ধরায় তোলে মাথা।
মুক্তিযুদ্ধ শেখ মুজিবুর
একই সঙ্গে গাঁথা।

শেখ মুজিবের সোনার বাংলা
মোদের জন্মভূমি।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
হৃদয় প্রাণে তুমি।

গল্প

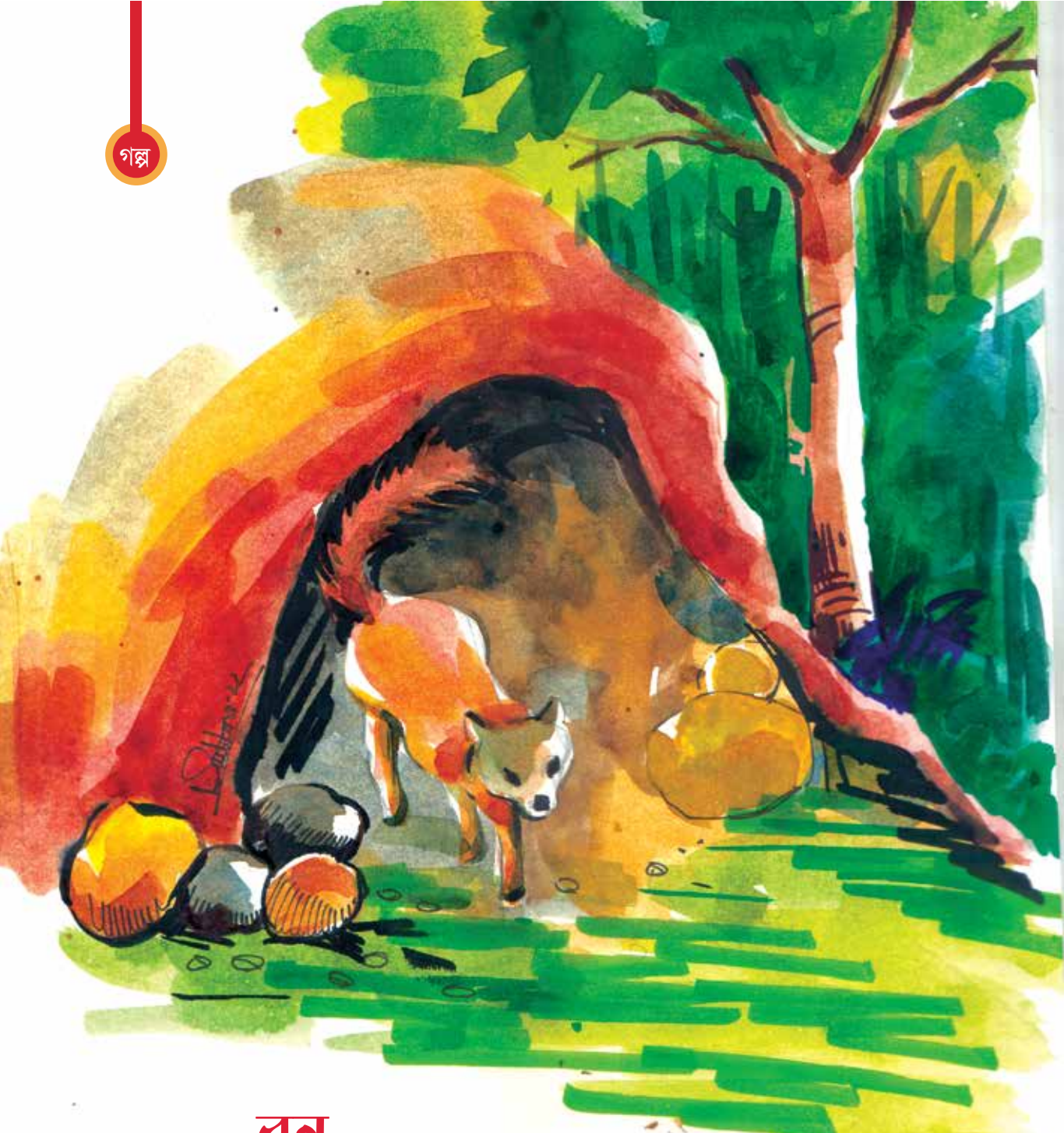

# বন মোরগের লড়াই

ইউনুস আহমেদ

ভীষণ পাজি এক শেয়াল। পুরো জঙ্গল দাবড়ে বেড়ায়। জঙ্গলেই শেয়ালটার বাস। জঙ্গলের শেষ প্রান্তে উঁচু একটা লাল মাটির ঢিবি। ঢিবির নিচে একটা গর্তে শেয়ালটা থাকে। সকাল হলেই সেখান থেকে বের হয় পাজি শেয়ালটা। তারপর হামলে পড়ে সব নিরীহ পশুপাখির ওপর। আরও অনেক পশুপাখি সেই

জঙ্গলে বাস করে। কিন্তু পাজি শেয়ালের কারণে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে না সবাই। এ নিয়ে সবার খুব দুঃখ।

বনের মাঝখানে উঁচু একটা গাছ। মোটা গুঁড়িওয়ালা গাছটাতে বাস করে কয়েকটা বনমোরগ। ভোরে উঠে যখন খোঁড়ল থেকে বের হয়ে 'কুককুরুক কুক' বলে ডেকে ওঠে তখন সব পশুপাখি আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। একদিন বনের বাকিসব পশুপাখি সেই গাছের নিচে এসে হাজির। গাছের ওপর থেকেই বনমোরগ বলে ওঠল, কী হে ভায়া, সব দলবল নিয়ে সকাল সকাল হাজির। ব্যাপারখানা কী?

: ব্যাপার আর কিছুই না, পাজি শেয়ালটা। ধেড়ে ইঁদুরটা কাঁপতে কাঁপতে বলল।

: কেন কী করেছে শেয়ালটা? বনমোরগ জিজ্ঞেস করল।

: কী আর করবে? আমাদের সবার ওপর হামলে পড়তে চায়। যেখানেই যাই, আমাদের পিছু নেয়।

: তাহলে তো ভারি বিপদের কথা।

: তাই আমরা এসেছি তোমার কাছে। একটা কিছু করো আমাদের জন্য। আমরা শান্তি চাই।

: ভেবো না, তোমরা সব এক থাকলে পাজি শেয়ালটা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর শোনো, এরপর যদি কখনো শেয়ালটা তোমাদের পিছু নেয় সোজা আমার এখানে চলে আসবে। মনে থাকবে কথাটা?

: হ্যাঁ, মনে থাকবে। এ কথা বলে বনের সব পশুপাখি যার যার কাজে চলে গেল।

কয়েকদিন পরের কথা। একদল খরগোশ ঘাসের বনে লুটোপুটি খেলছিল। চুপি চুপি শেয়ালটা এগিয়ে আসছিল। খরগোশগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ার আগেই দাঁড়কাকটা কর্কশ স্বরে কা কা করে উঠল। দাঁড়কাকটা জামগাছের পাকা জাম আয়েশ করে খাচ্ছিল। বনের সবাই তাকে বেশ সমীহ করে। এদিকে খরগোশের দল ছুটল বনমোরগের গাছবাড়ির দিকে। শেয়ালও ছুটল। কাঠবিড়ালি লাফিয়ে গিয়ে খবর দিলো বনমোরগকে। দূর থেকে বনমোরগ দেখল এই অবস্থা। সে ওড়াল দিয়ে এসে পড়ল পাজি শেয়ালটার সামনে। বুক উঁচু করে গলা ফুলিয়ে এগিয়ে গেল পাজি শেয়ালটার দিকে। মোরগ লড়াইয়ে সে এই জঙ্গলের চ্যাম্পিয়ন। দেখাদেখি আরও কয়েকটা বনমোরগ এগিয়ে এল। ধারালো নখ উঁচিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। বনমোরগের দল চারদিকে থেকে ঘিরে ধরল পাজি শেয়ালটাকে। মোরগদলের রণমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল পাজি শেয়ালটা। সে জঙ্গল ছেড়ে পালালো।

বনের সবাই এসে অনেক ধন্যবাদ দিল মোরগদলকে। বলল, বিপদে যে এগিয়ে আসে সেই-ই প্রকৃত বন্ধু। ■

---

*শিশু সাহিত্যিক*

# রূপকুমারী

মোসা. মনিরা আহামেদ সিনথিয়া

রূপকুমারী, রূপকুমারী
কোথায় তোমার ঘর
রূপের রানি হয়ে ঘুরে বেড়াও
নাই কি কোনো ডর?

রূপকুমারী ঘুরে বেড়ায়
তেপান্তরের মাঠে,
যেথায় যায় সেথায় পায়ে
নূপুর দিয়ে হাটে।

রূপের ডালি সাজিয়ে রেখে
মাথায় দেয় ঘোমটা,
অনেক মানুষ চেয়ে থাকে
আমার ভরে মনটা।

রূপকুমারী, রূপকুমারী
কোথায় তুমি যাও,
পদ্মা নদীর মাঝখানেতে
বাঁধা তোমার নাও।

বাজার করে ফেরো যখন
রূপনগরের মাঝে,
সেথায় তোমার সঙ্গে থাকে
তোমার সেই মা, যে।

স্রষ্টারই সৃষ্টি তুমি
রূপকুমারী নারী,
তোমার পানে না চেয়ে
আমি কি থাকতে পারি?

# হতে চাই বড়ো

কামাল হোসাইন

আমাদেরও আছে অধিকার
ফুলে ফলে বেড়ে উঠবার।
আমরাই আগামীর ফুল
আমরাই শান্তির মূল।

আমরাই আলোকিত ভোর
ঠেলে দেব যত আছে ঘোর।
আমরাই পাখিদের গান
চারিদিকে সুখ অফুরান।

আমরাও বড়ো হতে চাই
সে সুযোগ কোথা গেলে পাই!
আমরাই জল কাদা মাটি
পেলে পুষে করো যদি খাঁটি
আমরাই গড়ব এ দেশ
থাকবে না হাহাকার-রেশ।

# রাসেলের পায়রা

## তৌফিক আলম

পায়রা ছিল অনেক প্রিয়
খাবার খাওয়াতেন নিজ হাতে
সময় কাটাতে ভালোবাসতেন
পোষা পায়রার সাথে।
বাড়ির সারা আঙিনা জুড়ে
রাসেল চলাতেন প্রিয় সাইকেল
পুরো বাড়ি মাতিয়ে তুলতেন
বাজিয়ে টিং টং বেল।

১০ম শ্রেণি কুমিল্লা মর্ডান স্কুল, কুমিল্লা

# ফরিং-এর বিয়ে

## সাকুরা মেহজাবীন তনয়া

ঘাস ফরিং-এর বিয়ে
টোপর মাথায় দিয়ে।
সাজটা লাগছে বেশ
মুখে হাসির রেশ
গঙ্গা ফরিং সাজে বৌ,
পালকি চড়ে মুখটা মৌ।
টুনটুনি ঘর বানাবে খেজুর পাতা দিয়ে,
পাখিরা ব্যস্ত সবে দাওয়াত দেয়া নিয়ে
জোনাকিরা আনবে আলো
বাবুই সাজাবে বাড়ি।
প্রজাপতি আনবে গিয়ে বানারশি শাড়ি।
ময়না পাখি গাইবে গান দোয়েল-কোয়েল নিয়ে!
কাকাতুয়া কাজি হবে সাক্ষি ফিঙে-টিয়ে
বুলবুলি আর চড়ুইপাখি ব্যস্ত তদারকি নিয়ে।

৮ম শ্রেণি, রাজশাহী কলিজিয়েট স্কুল, রাজশাহী

# বন্ধুত্ব

## মালিহা আলী জয়া

বন্ধু হলো সুখ-দুঃখের সাথি,
আমি যেন উড়াল পাখি।
বন্ধু তুমি থাকলে পাশে,
মন শুধু হাসে।
বন্ধু মানে Fun is everytime,
বন্ধু মানে No Thanks No Sorry,
বন্ধু মানে অবহেলা নয়,
আপন করে নিতে হয়।

৫ম শ্রেণি, দনিয়া গভর্মেন্ট প্রাইমারি স্কুল, ঢাকা

# স্বপ্ন

## লামিয়া হোসেন

অনেক রঙের স্বপ্নগুলো
রঙিন সুতোয় বোনা
বাড়ছে স্বপ্ন অবিরত
যায় না তাকে গোনা।
স্বপ্নগুলো রাখি জমা
মনের খামের ভাঁজে
যখন তখন স্বপ্ন দেখি
নানান কাজের মাঝে।

৭ম শ্রেণি, মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী

# বিদায় লিলিবেট

শাহানা আফরোজ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আসীন ও বিশ্বের প্রবীণতম রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ চলে গেছেন না ফেরার দেশে। ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২২ বৃহস্পতিবার ৯৬ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

তার জীবনের দিকে ফিরে তাকালে শিশু থেকে উত্তরাধিকারী হওয়া এবং সেখান থেকে ব্রিটেনের দীর্ঘ সময় ধরে রাজত্বকারী রানিকে আমরা দেখতে পাই। রানির রাজত্বকালে যুক্তরাজ্য ছাড়াও আরও প্রায় ৩২ টি দেশের রানি ছিলেন এবং মৃত্যুকালে রাজত্ব ছিল ১৪ টি । তার ৭০ বছর ২১৪ দিনের রাজত্ব ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে দীর্ঘতম এবং তিনি ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘসময় যাবত ক্ষমতায় থাকা নারী রাষ্ট্রপ্রধান।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের পুরো নাম এলিজাবেথ আলেকজান্ড্রা ম্যারি। রানির পিতামহ রাজা জর্জের রাজত্বকালে ১৯২৬ সালের ২১শে এপ্রিল ২টা বেজে ৪০ মিনিটে (জিএমটি ) লন্ডনের ১৭ ব্রুটন সেন্টে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বছরের ২৯ মে বাকিংহাম প্যালেসের ব্যক্তিগত চ্যাপেলে তার নামকরণ করা হয়।

রানির বাবা ডিউক অফ ইয়র্ক (পরে রাজা ষষ্ঠ জর্জ) ছিলেন রাজা জজ -এর দ্বিতীয় পুত্র । মা ডাচেস অভ ইয়র্ক (এলিজাবেথ বোয়েস লিয়ন) ছিলেন স্কটিশ অভিজাতদের আর্ল অফ স্ট্রথমোর এবং কিংহর্নের কনিষ্ঠ কন্যা। এলিজাবেথের একমাত্র বোন প্রিন্সেস মার্গারেট ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ছোট্ট এলিজাবেথকে দাদা রাজা পঞ্চম জর্জ আদর করে লিলিবেট বলে ডাকতেন। রাজপ্রাসাদে ছিল সবার চোখের মণি। এছাড়াও আরো সুন্দর একটি নাম দিয়েছিলেন দাদা - এলিজাবেথ অ্যালেকজান্ড্রা মেরি । রানির মায়ের নাম এলিজাবেথ, অ্যালেকজান্ড্রা ছিল পঞ্চম জর্জের মায়ের নাম, এলিজাবেথের জন্মের মাত্র ছয় মাস আগে তিনি মারা গিয়েছিলেন । আর মেরি ছিল এলিজাবেথের দাদির নাম।

জীবনের প্রথম এক দশকে রানি হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করেননি লিলিবেট। তিনি ছিলেন এক স্বাধীন শিশু। প্রিয় কুকুর এবং ঘোড়ার সঙ্গে খেলা করাই ছিল তার শখ এবং ধ্যান-জ্ঞান। ঐ সময় এলিজাবেথ দাদার সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। এলিজাবেথ এবং তাঁর বোন মার্গারেট রোজ দুজনেই লেখাপড়া শিখেছেন বাড়িতে। প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলে শিক্ষা না পেলেও ভাষার প্রতি এলিজাবেথের ভালো দখল ছিল। বাকিংহাম প্যালেসে গার্ল গাইডস সংস্থাটি প্রথম গঠিত হয়েছিল যাতে লিলিবেট নিজের বয়সের মেয়েদের সাথে সামাজিকীকরণ করতে পারেন। পরে তিনি সি রেঞ্জার হিসেবে ভর্তি হন।

লিলিবেটের জীবনে প্রথম নাটকীয় পরিবর্তন আসে ১৯৩৬ সালে। ঐ বছর তার চাচা ডেভিড অষ্টম অ্যাডওয়ার্ড ব্যক্তিগত কারণে সিংহাসন ত্যাগ করেন। এলিজাবেথ সেই সময় জেনে গিয়েছিলেন তিনিই হচ্ছেন ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ রানি। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সবাই যখন তাদের সন্তানদের যুদ্ধ থেকে রক্ষা করছিল মা এলিজাবেথ থেকে তখন দুবোন শিক্ষা পাচ্ছিলেন কীভাবে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়। ১৯৪০ সালে ১৪ বছরের এলিজাবেথ প্রথমবারের মতো সরাসরি জনসংযোগে এলেন বিবিসির রেডিও অনুষ্ঠান চিল্ড্রেন আওয়ারের মধ্য দিয়ে। শুধু তাই না এলিজাবেথ ব্রিটিশ আর্মির ছোটোদের একটা

রেজিমেন্টে যোগ দেন । বাবা যখন দেশের বাইরে থাকতেন তিনি দেশের পাঁচজন কাউন্সিলরের একজন হিসেবে কাজ করতেন।

১৯৪৭ সালের ২০শে নভেম্বর এলিজাবেথ ও ফিলিপ ওয়েস্টমিনস্টার গির্জায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৫২ সালে যখন এলিজাবেথের বয়স ২৫ তখন রাজা ষষ্ঠ জর্জ ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নেন। এলিজাবেথ তাঁর স্বামীকে নিয়ে বিদেশ সফরে যান বাবার হয়ে দায়িত্ব পালন করতে। ফেব্রুয়ারি মাসে এলিজাবেথ কেনিয়ায় বসে বাবার মৃত্যু সংবাদ পান। ১৯৫৩ সালের ২রা জুন মাস আনুষ্ঠানিক অভিষেক হয়।

এভাবে এগিয়ে যায় এলিজাবেথের গল্প। জীবনে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন । শরীর ভেঙে গেছে তবুও শক্তিশালী মানসিকতায় ধরে রেখেছেন তার সাম্রাজ্য। দীর্ঘ জীবনে রানি এলিজাবেথ চার সন্তান আট নাতি-নাতনি এবং তাদের ঘরে আরও ১২ জন নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ দু'বার ঢাকায় এসেছেন। প্রথমবার এসেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আমলে। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সালে। রানির রাজকীয় বিমানে

নেমেছিলেন পুরনো বিমানবন্দরে। তখন রানি বের হয়েছিলেন স্টিমারে বুড়িগঙ্গা ভ্রমণে। ভ্রমণ শেষে রানি যান আদমজী জুট মিলে।

দ্বিতীয়বার ১৯৮৩ সালের ১৪ই নভেম্বর বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সময় তিনি ট্রেন ভ্রমণ করেছিলেন। চট্টগ্রামের একটি মডেল গ্রাম ছাড়াও হস্তশিল্প, সোনার চাদর এবং মাটির পাত্রসহ বিভিন্ন কারুশিল্প রানিকে মুগ্ধ করেছিল।

# আমার বন্ধু শেখ রাসেল

শেহজাদী ফারহা অর্থি

করোনা এসে যখন আমাদের শহরটাকে লকডাউনে ফেলে দিল। তখন আমি একটা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলাম। চলচ্চিত্রটির নাম ছিল 'নেত্রকোণায় বঙ্গবন্ধু। আমি বঙ্গবন্ধুর অনেক ছবি এঁকেছি শ্যুটিংয়ের জন্য। বঙ্গবন্ধুর অনেক ছবি দেখেছি, বই পড়েছি। এই সময়েই শেখ রাসেল সম্পর্কে জেনেছি। শেখ রাসেল আমাদের মতো বয়সি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র। তার জন্ম ১৮ই অক্টোবর ১৯৬৪। তার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ হলেও জন্মগ্রহণ করেছে ঢাকার ধানমণ্ডিতে। শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তো। আমার খুব কষ্ট লেগেছে, যখন পড়েছি আমার বয়সি শেখ রাসেলকে হত্যা করা হয়েছে। একদল সেনা ট্যাঙ্ক দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি ঘিরে ফেলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তার পরিবার এবং ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সাথে শেখ রাসেলকেও হত্যা করা হয় তখন। সে সময়টি ছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট।

যারা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের মানুষদের ও শেখ রাসেলকে হত্যা করেছে এরা ভালো মানুষ নয়। এরা বাংলাদেশকে ভালোবাসে না। আমি এদের ঘৃণা করি।

*দ্বিতীয় শ্রেণি, আদর্শ শিশু বিদ্যালয়, নেত্রকোণা*

**রহমাতুল আলম**
১ম শ্রেণি
গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

# বাঘিনীদের জয়ের গল্প

মেজবাউল হক

হিমালয়ের দেশে হিমালয়ের চূড়ায় উঠার কথা নেপালিদেরই। কিন্তু হিমালয়ের চূড়ায় উঠল বাংলার বাঘিনীরা। অপ্রতিরোধ্য, অদম্য বাংলাদেশকে থামানোর সাধ্য নেপালের ছিল না। ১৯শে সেপ্টেম্বর নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে ৩-১ গোলে হারিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতে নিল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। এই জয়ের আনন্দে ভাসছে পুরো বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের হারিয়ে বাংলাদেশের নারীদের এ সাফল্য খুলে দিয়েছে ফুটবলের নতুন দুয়ার। সাবিনারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, গর্বিত করেছেন জাতিকে, ভাসিয়েছেন অনাবিল আনন্দে। আনন্দের দোলা দুলে উঠেছে লাল-সবুজের প্রতিটি মানুষের হৃদয়।

### সেরা গোলকিপার রুপনা চাকমা

টুর্নামেন্টে সেরা গোলকিপার হয়েছেন বাংলাদেশের রুপনা চাকমা। ৫ ম্যাচের মধ্যে শুধু ফাইনালে তার বিপক্ষে গোল হয়েছে মাত্র একটি। পুরো টুর্নামেন্টে দেখিয়েছেন অসাধারণ নৈপূণ্য। বিশেষ করে ফাইনালে তার গোলকিপিং সবার নজর কেড়েছে। প্রতিপক্ষের প্রতিটি আক্রমণ দারুণভাবে প্রতিহত করেছেন রুপনা।

## সর্বোচ্চ গোলদাতা সাবিনাই সেরা খেলোয়াড়

বাংলাদেশ নারী ফুটবলে প্রথম সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ে বড়ো অবদান রেখেছেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন। ৮ গোল করে টুর্নামেন্টে তিনিই সর্বোচ্চ গোলাদাতা। যার মধ্যে দুটি হ্যাটট্রিক। দারুণ খেলে হয়েছেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ও। ফাইনালে নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনে থেকে। গোল না পেলেও সাবিনা, গোল করিয়েছেন। প্রতিটি ম্যাচে কোনো না কোনোভাবে দলের জয়ে অবদান থাকেই সাবিনার। প্রথম ম্যাচে মালদ্বীপের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ে সাবিনার দুই গোল। পাকিস্তানের বিপক্ষে দলের ৬-০ গোলে জয়ে সাবিনার তিন গোল। সেমিফাইনালে বাংলাদেশ ৮-০ গোলে উড়িয়ে দেয় ভুটানকে। সাবিনা হ্যাটট্রিক করেন সে ম্যাচে।

## ছাদ খোলা বাসে সংবর্ধনা

নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো সাফ উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। সাফ চ্যাম্পিয়ন দলকে ছাদ খোলা বাসে সংবর্ধনা দিয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সকল নারী খেলোয়াড়দের ফুল ছিটিয়ে বরণ করা হয়। এরপর ছাদ খোলা বাসে করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে নিয়ে আসা হয়। সেখানেও তাদেরকে বরণ করে বাফুফে ও সাধারণ জনগণ। রাস্তায় আসার পথে সাধারণ মানুষ ও তাদের প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। ■

# এশিয়ার সেরা বাংলাদেশের ফুচকা

ফুচকার নাম শুনে জিভে জল আসে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড এটি। রাস্তার আশপাশে ছোটো-বড়ো দোকানে যেসব খাবার বিক্রি করা হয় সেগুলোকেই সাধারণত স্ট্রিট ফুড বলা হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও রাস্তার পাশের খাবার বা স্ট্রিট ফুড বেশ জনপ্রিয়। এসব খাবারের অন্যতম হচ্ছে ফুচকা।

সম্প্রতি মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন ট্র্যাভেল এশিয়ার ৫০টি সেরা স্ট্রিট ফুডের তালিকা করেছে। জনপ্রিয় 'কোয়েস্টস ওয়ার্ল্ড অব ওয়ান্ডার' সিরিজের অংশ হিসেবে করা এ তালিকায় স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশের মুখরোচক খাবার ফুচকা। এর ফলে এ খাবারটি পেল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বর্তমানে বিশ্বের আধুনিক ফুড কালচারের একটি অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে এই স্ট্রিট ফুড। বৈচিত্র্য খুঁজতে গিয়ে বিদেশি পর্যটকরাও অনেক সময় পাঁচতারা হোটেলের চেয়ে এই স্ট্রিট ফুডে বেশি আনন্দ পান।

আগস্টের ২৪ তারিখ সিএনএন ট্র্যাভেল প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে ফুচকা সম্পর্কে বলা হয়, টক-মিষ্টি মশলাদার ফুচকা বাংলাদেশের স্ট্রিট ফুডগুলোর অন্যতম। ফুচকার কাছাকাছি সংস্করণ ভারতে পানিপুরি, গোলগাপ্পা, গুপচুপ। ফুচকার পরিচয় ও পরিবেশন পদ্ধতি সম্পর্কে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, মচমচে ফাঁপা গোলকের মধ্যে প্রথমে দেওয়া হয় ডাবলি মটর আর আলুর মিশ্রণে তৈরি পুর। পরে পেঁয়াজ, শসা, ধনেপাতা, কাঁচামরিচ এবং চটপটির বিশেষ মসলা মেশানোর পর এই ফুচকা অন্যরকম সুস্বাদু হয়ে ওঠে। এটি সাধারণত তেঁতুল মিশ্রিত পানি বা সস দিয়ে পরিবেশন করা হয়। পরিবেশন করার আগে বিক্রেতারা প্রায় সময় গার্নিশ হিসেবে ওপরে সেদ্ধ ডিমের কুচি ও সালাদ দিয়ে থাকেন। তবে ফুচকার সঙ্গে দেওয়া তেঁতুলের চাটনিই সবচেয়ে আলাদা।

সিএনএনের ওই প্রতিবেদনে এশিয়ার সেরা ৫০ খাবারের মধ্যে স্থান পেয়েছে শ্রীলংকার আচারু ও হপার্স, পাকিস্তানের ফালুদা ও বান কাবাব, ভারতের জিলাপি, নেপালের মোমো, ভুটানের এমা ডাটশি, মালদ্বীপের কাভাবু, থাইল্যান্ডের খাও সোই, মালয়েশিয়ার নাসি লেমাক, ভিয়েতনামের বান মি এবং ফো, তাইওয়ানের বাবল টি, ইন্দোনেশিয়ার গাডো গাডো, ফিলিপাইনের হালো হালো ও কোয়েক কোয়েক, চীনের জিয়ানবিং ও জিয়াওজি, মিয়ানমারের লাহপেত থোকে, জাপানি আইসক্রিম সোফুতো কুরিমু ইত্যাদি জনপ্রিয় খাবার। ■

*প্রতিবেদন: জুনায়েদ কবির*

# ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম সুমাইয়ারা

গুচ্ছভুক্ত ২২টি সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটে একই নম্বর পেয়ে যৌথভাবে প্রথম হয়েছে দুই শিক্ষার্থী। তাদের দুইজনের নামই সুমাইয়া। ৪ঠা আগস্ট প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী তারা দুজনই ১০০ তে পেয়েছে ৮৭.৫ নম্বর।

একজনের নাম সুমাইয়া রহমান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার বাসা ঢাকার বনশ্রীতে। আরেকজন সুমাইয়া বিনতে মাসুদ। তিনি খুলনার পাইকগাছা উপজেলার চাঁদখালি ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর গ্রামের মেয়ে। তিনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে।

সুমাইয়া রহমান পরিবারের সঙ্গে সৌদি আরবের জেদ্দায় থাকতেন। দশম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা করে দেশে এসে এসএসসি পরীক্ষা দেন এবং জিপিএ-৫ পান। হলিক্রস কলেজ থেকে এইচএসসি তেও জিপিএ-৫ পান তিনি। তার পছন্দ সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। খুলনার মেয়ে সুমাইয়া বিনতে মাসুদ পাইকগাছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও খুলনার সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ থেকে এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। গুচ্ছের ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তারও পছন্দ সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

তাদের উভয়েরই মতো ভালো ফলাফলের জন্য রাত জেগে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। নিজে রুটিন করে প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করতে হবে। সবার উপরে পাঠ্যবইকে গুরুত্ব দিতে হবে। পাঠ্যবইয়ের কোনো বিকল্প নেই। ভর্তি পরীক্ষায় শর্টকাট বলে কোনো কথা নেই।

উল্লেখ্য সারা দেশের ১৯টি কেন্দ্রের ৫৭টি ভেন্যুতে একযোগে অনুষ্ঠিত গুচ্ছের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই লাখ। ■

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

# শিশুর মানসিক বিকাশে বই

আজকাল বেশিরভাগ শিশুই মোবাইল ফোনে আসক্ত। ট্যাব বা স্মার্টফোনের এ আসক্তি শিশুর মানসিক বিকাশে বাধা দেয়। শিশুর হাতে মোবাইল নয় বরং তার হাতে তুলে দিতে হবে বই। আজকের যে শিশু বইয়ের প্রতি যত আসক্ত সে শিশু তত বেশি এগিয়ে।

বই পড়ার জন্য প্রথম প্রয়োজন অভ্যাস। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, শৈশব থেকেই এই অভ্যাস তৈরি করতে হবে, এটা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। অভিভাবকদেরকেই এ দায়িত্বটা নিতে হবে। সব শিশুই বই ভালোবাসে, বিশেষ করে আনন্দমূলক কোনো বই। এ ধরনের কোনো বই হাতের কাছে পেলেই তারা পড়তে চেষ্টা করে। অভিভাবকদের উচিত শিশুদের এ আগ্রহটা কাজে লাগানো। শিশুরা যখন একটু পড়তে শেখে, তখন সে অনেক কিছুই পড়তে চায়। অনেক অভিভাবক পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই পড়তে দিতে নারাজ। এটা ঠিক নয়; বরং বই পড়ার ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করা ও নতুন ভালো ভালো বই কিনে দেওয়া।

বই মানুষের জীবনের নিত্য সঙ্গী । শিক্ষা অর্জনের একমাত্র ধারক ও বাহক হলো বই। বই মানুষের মনের খোরাক জোগায়, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। মানুষের প্রতিভাকে ফুলের মতো প্রস্ফূটিত করে। যে জাতি যত শিক্ষিত সেই জাতি তত উন্নত। আর এই উন্নতির মূলে রয়েছে বই। বই মানুষের জীবনকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়। মনীষী লিও তলস্তয় বলেছেন, মানুষের জীবনের শুধু তিনটি জিনিসের প্রয়োজন সে তিনটি জিনিস হলো বই, বই এবং বই।

আজকের শিশু আগামী দিনের দেশের যোগ্য নাগরিক, তাই একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কোমলমতি শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত, তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়তে অবশ্যই শিশুদের বই পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ■

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

## বৃদ্ধাশ্রমে শিশু নিয়োগ

গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। তবে শর্ত হচ্ছে বয়স হতে হবে চার বছরের নিচে! বেতনও দেওয়া হবে কাজের জন্য। বিজ্ঞপ্তিটি দিয়েছে জাপানের একটি বৃদ্ধাশ্রম। বৃদ্ধাশ্রমটির নাম কিটাকিউশুর। অদ্ভুত একটি বিজ্ঞপ্তি তাই না বন্ধুরা? আর তাদের বেতন কী হবে জানো? বেতন হবে দুধ ও ডায়াপার! এখানে নিয়োগ পাওয়া শিশুর অভিভাবকদের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়। চুক্তিটি এরকম: শিশুরা যখন মর্জি কাজে আসবে, তারা ক্ষুধার্থ হলে বা ঘুমের সময় বিশ্রামের সুযোগ পাবে, কাজের কোনো নির্ধারিত সময় থাকবে না। তারা বৃদ্ধাশ্রমের চারপাশে ঘুর ঘুর করবে। অভিভাবকরাও তাদের সাথে থাকবেন। এখানে একশরও বেশি বাসিন্দা যাদের বয়স আশির ঘরে তাদের উৎফুল্ল রাখার কাজ করবে এই শিশুরা। শিশুদের পেয়ে বৃদ্ধাশ্রমের লোকজনও অনেক আনন্দিত। শিশুদের সাথে তারা খেলছেন, কথা বলছেন ও জড়িয়ে ধরছেন। জাপানের এই প্রকল্পটি দুর্দান্তভাবে সফল হয়েছে।

## বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ পাইলট

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ পাইলট ম্যাক রাদারফোর্ড। বয়স ১৭ বছর। এরই মধ্যে বিশ্বের ৫২টি দেশ ভ্রমণ করে ফেলেছেন তিনি। তবে কারো সঙ্গে নয়, একা একা, তাও আবার নিজে প্লেন চালিয়ে! বিশ্বের সবচেয়ে ছোটো বৈমানিক হয়েও সবচেয়ে বেশি দেশ ঘোরার বিশ্বরেকর্ড করেছেন তিনি। ম্যাক তার ছোট্ট শার্ক বিমানটি নিয়ে ২০২২ সালের ২৩শে মার্চ বুলগেরিয়ার সোফিয়া বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেন। ১৮৩ দিন পর ২৪শে আগস্ট একই বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এই সময়ের মধ্যে ৫২টি দেশ ঘুরেছেন তিনি। বুলগেরিয়ার সোফিয়া থেকে তিনি যেদিন যাত্রা শুরু করেন তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর। নিজের ১৭তম জন্মদিনটি তিনি শার্ক বিমানের ভেতরেই উদযাপন করেছেন। ম্যাকের বিমানটি ছিল খুবই হালকা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন। যার স্বাভাবিক গতি ঘণ্টায় ৩০০ কিলোমিটার।

## লিম্বো স্কেটিং করে বিশ্বরেকর্ড

স্কেটিং খেলাটি সম্পর্কে কমবেশি তোমরা সবাই জানো তাই না বন্ধুরা। পা চলবে কিন্তু হাঁটার কোনো কষ্ট নেই। স্কেটিংয়ের মজাই কিন্তু আলাদা। স্কেটিংয়ে বিশ্ব রেকর্ড করা ছোট্ট এক বন্ধুর কথা বলব আজ। স্কেটিং দ্রুতগতিতে পথ চলাই নয়, এটি আসলে এক ধরনের খেলা। যে খেলাটি তোমাদের শরীর ফিট রাখতেও সাহায্য করবে। চাকাযুক্ত বিশেষ জুতা পড়ে গতিময় ছুটে চলার একমাত্র সহজ উপায় হলো স্কেটিং। স্কেটিং এর মধ্যে একটি হচ্ছে 'লিম্বো স্কেটিং' - খেলা। এটি অনেক বেশি কঠিন। এক্ষেত্রে স্কেটিং ভালো জানতে তো হয়ই পাশাপাশি শরীরকে হতে হয় অতি নমনীয়। তেমনই একজন ছোট্ট বন্ধু দেশনা নাহার। বয়স মাত্র ৭। দেশনা ২০টি গাড়ির নিচ দিয়ে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে স্কেটিং করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস বইয়ে নাম লিখিয়েছে। ২০টি গাড়ির নিচ দিয়ে স্কেটিং করতে তার সময় লেগেছে মাত্র ১৩.৭৪ সেকেন্ড। ভেঙেছে ৭ বছর আগের ১৪.১৫ সেকেন্ডে ২০টি গাড়ির নিচ দিয়ে করা রেকর্ডটি। ভারতের মহারাষ্ট্র-এর বাসিন্দা দেশনা। ৫ বছর বয়স থেকেই সে স্কেটিং শিখেছে।

## অ্যানিমেশন নির্মাতা শামীমা শ্রাবণী

বর্তমানে জনপ্রিয় অ্যানিমেশন ভিডিও কন্টেন্ট নির্মাতা শামীমা শ্রাবণী। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ তার মজার ভিডিওগুলো। যেখানে রয়েছে ইয়ামিন, টাইফুনসহ আরও মজার মজার চরিত্র। শ্রাবণীর ভিডিও কন্টেন্ট বানানোর শুরুটা একটু অন্যরকম। নিজের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা না দেখিয়ে ভিডিও তৈরির মিশনে নামেন এই কিশোরী। ভালো ছবি আঁকার দক্ষতা দিয়ে শুরু করে অ্যানিমেশন ভিডিও তৈরির কাজ। ভিডিও বানাতে গিয়ে ব্যর্থও হতে হয়েছে তাকে। শামীমার ভিডিওর অন্যতম মজার চরিত্র ইয়ামিন হচ্ছে তার বোনের ছেলে। যে অনেক ছোট্ট। তার দৈনন্দিন চলাফেরা ও কথাগুলোই তুলে ধরা হয় এ ভিডিওগুলোতে। সম্প্রতি 'চ্যানেল আই ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড'– পেয়েছেন শ্রাবণী। Walt Disney Animation Studios-এর মতো একটি বড়ো অ্যানিমেশন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছেন শ্রাবনী। আর হ্যাঁ, অ্যানিমেশন নির্মাণের পাশাপাশি তিনি কিন্তু তার পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন বেশ ভালোভাবেই।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

# ছোটোদের আঁকা

**মো. সাজ্জাদ হোসেন,** নবম শ্রেণি, মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর-১, ঢাকা

**মো. ইরফান হোসাইন,** দ্বিতীয় শ্রেণি, ইন্দ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঘারপাড়া, যশোর

# ছোটোদের আঁকা

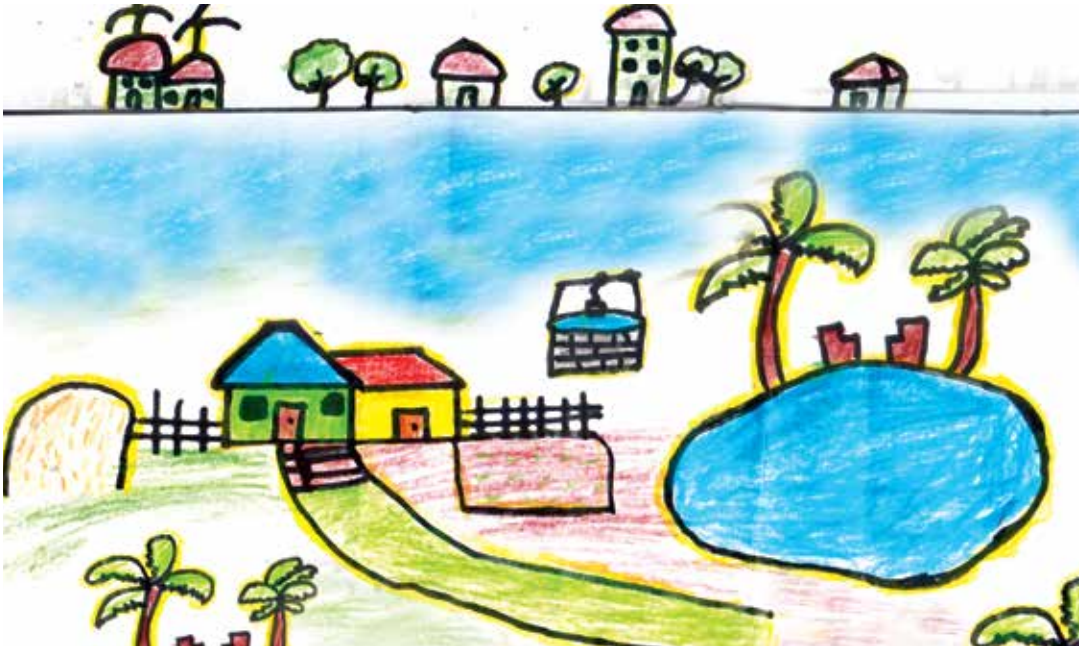

**ফাতেমা আক্তার ইচ্ছে,** ২য় শ্রেণি, গ্লাসগো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

**নীলাদ্রি শেখর সমদ্দার,** ১ম শ্রেণি, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটিরিয়াল স্কুল

# নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
**google play store**-এ
**nobarun** লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
**e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd**

## অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

**সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)**
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
**তথ্য ভবন**
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

## নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-04, October 2022, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়**
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা